ভে ত রে

'প্রেম জিহাদ' নিয়ে গালগল্পর আসল উদ্দেশ্য ২
দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ে এ আই এস এ-র আত্মঘোষণা ... ৩
... ধান সংগ্রহে রাজ্য পিছিয়ে কেন? ... ৪
নির্মাণ শ্রমিকদের টাকা নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ৫
'বীর' সাভারকর, সঙ্ঘ পরিবার ঃ কিছু তথ্য ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৩৪ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৩ অক্টোবর ২০১৪

আর এস এস-বিজেপির উৎপাত ও উন্মাদের রাজনীতি প্রতিহত করুন

নব সরকার ওরফে জিতেন চ্যাটার্জী ওরফে ওঙ্কারনাথ ওরফে স্বামী অসীমানন্দের জবানবন্দী দিয়েই কথা শুরু করা যাক। আমাদের এ রাজ্যের হুগলী জেলায় কামারপুকুরে নব-র জন্ম। ওর কথায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের আদর্শে' অনুপ্রাণিত হয়েই ওর কর্মী জীবন শুরু। ২০১০ সালের ২৪ ডিসেম্বর সি বি আই-এর হাত থেকে নিয়া (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)-র হাতে আসার কিছুদিন আগে তিহার জেলে বন্দী আর এস এসের একনিষ্ঠ কর্মী অসীমানন্দ তিস হাজারী কোর্টের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দীপক দাবাস-এর কাছে এই জবানবন্দী দিয়েছিল (১৮ ডিসেম্বর, ২০১০)। কোন ভয়, ভীতি, হুমকি বা চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়, এ জন্য তাকে ৪৮ ঘন্টা স্বতন্ত্র সেলে রাখা হয়েছিল। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এক নিরপরাধ মুসলিম যুবককে মালেগাঁ বোমা বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার করার পর মনোবেদনায় তার এই স্বীকারোক্তি বলে নব ওরফে অসীমানন্দ জানিয়েছে। ২০০৬, ২০০৮ সালে মালেগাঁ বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদে মীনা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি লাহোরগামী সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণ এবং ঐ বছরেরই ১১ অক্টোবর আজমেঢ় শরীফে বোমা বিস্ফোরণ ও অসংখ্য হত্যার ঘটনায় আর এস এসের একনিষ্ঠ কর্মী

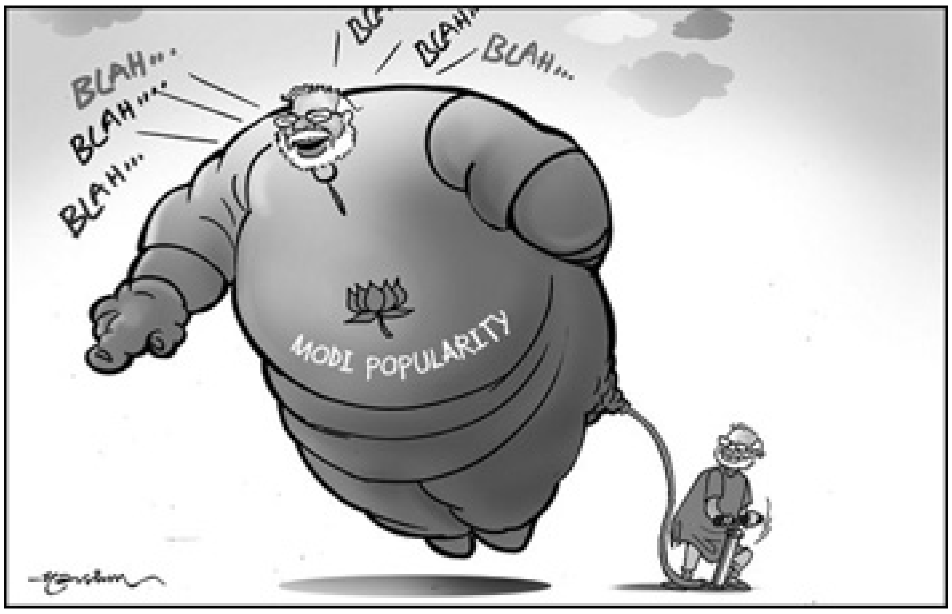

লোকেশ শর্মা, সন্দীপ ডাঙ্গে, প্রাক্তন আর এস এস প্রচারক সুনীল যোশী (পরে সন্দেহজনকভাবে খুন হয়ে যায়) ও অসীমানন্দকে গ্রেপ্তার করেছিল সি বি আই। জবানবন্দীতে অসীমানন্দ জানাচ্ছে, "**অভিনব ভারত ও জয় বন্দেমারতরম**, দুটিই আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের নেতৃত্বাধীন শাখা সংগঠন, 'হিন্দু ধর্ম রক্ষার' স্বার্থে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ২০০৮-এর বোমা বিস্ফোরণের নীল নকশা প্রস্তুতির কাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। আর এস এস-এর প্রচারক সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, দয়ানন্দ পাণ্ডে এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর কর্মরত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শ্রীকান্ত পুরোহিত এই বোমা বিস্ফোরণের ছক প্রস্তুত করার পর আর এস এস-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক **মোহন ভাগবতের** সঙ্গে আলোচনা করেই বিস্ফোরণ কাণ্ডগুলো সংগঠিত করে। এক একটি বিস্ফোরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিছু ভিন্নতা থাকলেও মূল লক্ষ্য ছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

হালদারদীঘির ধর্মঘট
হিমঘর শ্রমিক আন্দোলনে এক তাজা বাতাস

১৮ অক্টোবর '১৪ দুপুর ১টা। গনগনে রোদ্দুরে তাঁদের হাতের লাল ঝাণ্ডাগুলোকে দারুন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আরও বেশী উজ্জ্বল লাগছিল তাদের চোখ-মুখের বিজয়ের হাসি। তারা সকলেই আদিবাসী নারী-পুরুষ। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নিয়ে তারা ঘর ফিরছে। তাদের বাসভূমি হালদারদীঘি গ্রাম রাতারাতি উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। মিছিল-ধর্মঘট-অবরোধ-পুলিশের চোখে চোখ রেখে কথা বলা—সব মিলিয়ে প্রায় ৪৮ ঘন্টার লড়াইয়ে পার্শ্ববর্তী সি এ ডি পি হিমঘরের অবাধ্য কর্তৃপক্ষকে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য করেছে। শুধুমাত্র একটি হিমঘরের শ্রমিকদের সাহস, ঐক্য আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি গ্রামের ছোট্ট বৃত্ত ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে হুগলী জেলার হিমঘর শ্রমিক আন্দোলনের এক বৃহত্তর পরিসরে।

আন্দোলনের সূত্রপাত কী থেকে

বৈঁচী সি এ ডি পি-এফ এস সি এস একটি সমবায় সমিতি। হালদারদীঘীতে নিজস্ব হিমঘরে আলু সংরক্ষণই হল সমিতির সমস্ত কর্মকাণ্ডের আসল চাবিকাঠি। বছরখানেক আগে টি এম সি-পন্থীরা এই সমিতির পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই সমিতির নতুন কর্তারা হিমঘরের দুজন অস্থায়ী শ্রমিককে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। ভূমিহীন, অতি দরিদ্র আদিবাসী পরিবার থেকে আসা এই দুই শ্রমিকের নাম সনাতন সর্দার ও রবীন সর্দার।

রবীন ও সনাতন কী কাজ করতেন? কেনই বা তাঁদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল? এরা দুজনে অন্তত পাঁচ বছর ধরে এফ এস সি এস হিমঘরে অস্থায়ী মজুর হিসেবে কাজ করে এসেছেন। মূলত 'শর্টেজ আলু কালেকশন' ও জরুরী ভিত্তিতে চেম্বার থেকে আলু বের করা ছাড়াও প্রায় সারা বছরই হিমঘরের নানা ধরণের কাজ এঁরা করতেন, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল বলে এদের সুনাম আছে। এদের মজুরি ছিল দৈনিক ১৫০ টাকা।

নতুন কর্তারা এঁদের হুকুম দিলেন ঃ তোমরা সমবায় কর্মী হিসেবে নয়, ঠিকাদারের অধীনে কাজ কর। এদের মজুরি কমে দাঁড়াল দৈনিক ৮০ টাকা। এই ফতোয়ার প্রতিবাদ জানালে এঁদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সনাতন ও রবীনের বাড়ী হিমঘরটির একেবারে লাগোয়া হালদারদীঘি গ্রামে। ছোট এই গ্রামটিতে দীর্ঘদিন ধরেই সি পি আই (এম এল)-এর অল্প বিস্তর যোগাযোগ রয়েছে। সম্প্রতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মত গ্রামের মানুষদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও সংযোগ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। শ্রমিক সংগঠন হুগলী জেলা সংগ্রামী হিমঘর শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের মারফত ছাঁটাই শ্রমিক সনাতন ও রবীনকে কাজে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তোলা হয়। আক্রান্ত শ্রমিকদের পরিবার পরিজন সহ গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে (গ্রামবাসীদের অনেকেই হিমঘর শ্রমিক) ২৪ সেপ্টেম্বর হিমঘর চত্বরে কর্তৃপক্ষের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় (১) ছাঁটাই দুই অস্থায়ী শ্রমিককে আগের মতই সমিতির কর্মী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং অবিলম্বে তাঁদের পুনর্বহাল করতে হবে; (২) শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা চলবে না ও চুক্তিপ্রথা বাতিল করতে হবে। দাবিগুলোর সমর্থনে হিমঘরটির সিটু নেতাও বক্তব্য রাখেন। সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসার (ই ও) শ্রমিক সংগঠনের দাবিগুলোর সঙ্গে সহমত হন এবং জানান বিষয়টি তিনি পরিচালন সমিতির সভায় যথাযথভাবে পেশ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর সমিতির দপ্তরে গিয়ে ই ও-র সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি জানান পরিচালন সমিতি সংগঠনের দাবিকে নাকচ করেছে। সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, তাঁরা শ্রমিকের খরচ বাঁচানোর দোহাই দেন। তাঁরা বলেন, দু-জন শ্রমিককে দিন মজুরিতে নিয়মিত যেভাবে কাজ করানো হত তাতে যে অর্থ ব্যয় হত তার তুলনায় অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই দুজনের নির্দিষ্ট কাজও ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিলে অর্থের অনেক সাশ্রয় হবে। শ্রমিক ঠকানোর এক হাস্যকর যুক্তি। যাই হোক, সংগঠনের পক্ষ থেকে সমিতির নিজস্ব কর্মীকে ঠিকা কর্মীতে পরিণত করার বদ মতলব থেকে সমিতিকে সরে আসার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু কর্তারা কোন অনুরোধ বা দাবিই মানতে চান না। মজুরি কমে যাওয়ার প্রশ্নে কর্তারা মাথা চুলকাতে থাকেন এবং শ্রমিক দুজনকে যা তাদের কাজ নয় এমন কাজে লেগে পড়ার প্রস্তাব দেন। বলেন, তাহলে নাকি তাদের মজুরি কিছু বেড়ে যেতে পারে। শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই

তিনের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

রাজধানীতে ‘এইমস্’-এর সমাবর্তন উৎসবমঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপদেশবাণী শোনালেন, ‘চিকিৎসা গবেষণায় এখনও বহু পথ পাড়ি দেওয়া বাকী। তাই শেখার মনটা যেন হারিয়ে না যায়’ এর প্রত্যুত্তরে মানুষজন মোদীকে আরও পাঁচকথা শুনিয়ে দিতেই পারে। শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে কেন, জনগণের সেবার স্বার্থে কোনক্ষেত্রেই গবেষণাকাজের ও শেখার গুরুত্ব অপরিসীম। আর পুঁজির স্বার্থে যে কোন গবেষণায় বা ভূমিকা নেওয়ায় লিপ্ত থাকাটা আদ্যন্তই দেশবিরোধী, জনবিরোধী। মোদী যে চিকিৎসা ক্ষেত্র প্রসঙ্গে এতো বড় বড় সব কথা উত্থাপন করলেন তাঁর মানসিকতা ‘কত আন্তরিক’ তা নিয়েই প্রশ্ন তোলার সময় এসে গেছে। শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় স্তরে আসীন হওয়ার চার-পাঁচ সময় পার হয়ে গেছে। এখনও ভারতে প্রতিদিন সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে অতলে তলিয়ে যাওয়া তীব্র অর্থনৈতিক অভাব আর অনাহারে, যক্ষ্মায়, গণ আত্মহত্যায় আর বিনা চিকিৎসায় বা চিকিৎসার চূড়ান্ত অবহেলায়। মোদী জ্ঞানপাপীর মতই এসব অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ উদ্‌যাপনী লেকচার দেওয়ার সময় উল্লেখে গেলেন না। এই নির্মম পরিণতি কোন গবেষণাকাজে খামতি থাকার কারণে নয়। এহেন ফলশ্রুতির কারণ সম্পূর্ণ। সেটা হল, দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে চরম জনস্বার্থবিরোধী আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রীয় নীতিগুচ্ছের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে। খাদ্য থেকে নিরাময়ব্যবস্থা, উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ—সবকিছুরই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন করে চলার ক্ষমতা অবাধে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছে কর্পোরেট কুবেরশ্রেণীর কাছে। সরকারি বরাদ্দে যা কিছু ন্যূনতম প্রকল্পের অবশিষ্ট এখনও রাখা আছে, সেগুলোর ক্রমাগত সংকোচন ও বিলোপসাধনকেই রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, বিপরীতে সম্প্রসারিত ও তীব্র করে তোলা হচ্ছে কেবল দমন নীতিকে।

মোদীর কর্পোরেট ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রীয় অ্যাজেন্ডার লক্ষ্য হাসিল করতে বিজেপি-আর এস এস-এর শক্তিগুলো সব এখন এক কাট্টা। কেন্দ্র দখলের পর পরিকল্পনায় এখন একের পর রাজ্য দখলের নকশা। যেমন যেমন সুযোগ আসছে সামাজিক সমীকরণে সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক হাওয়া তুলতে রাজ্যভিত্তিক তেমন তেমন কৌশলগত ছকও নেওয়া হচ্ছে। বিশেষত হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য হাসিল হয়েছে দেখে সংঘশক্তিগুলো আরও উন্মত্ত হচ্ছে। ওদের এবার টার্গেট নাকি বাম ঐতিহ্যের পশ্চিমবঙ্গ!

গেরুয়া বঙ্গীয় ভৈরবশক্তি বর্ধমান খাগড়াগড়কাণ্ডকে এরাজ্যে তাদের পুনরুত্থানের চাবিকাঠি বানাতে চাইছে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রকেও ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে। এন আই এ এবং এন এস জি-র দাপাদাপি চলছে। ডাইন খোঁজার মতই মুসলিম সন্ত্রাসবাদী ধরার অভিযান চলছে। মাদ্রাসাগুলোকে নির্বিচারে চাঁদমারি বানানো হচ্ছে। একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যত ‘শত্রু-দেশদ্রোহী’ অভিযুক্ত করতে সন্দেহবাদের বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে। মাদ্রাসা মানেই যেন মুসলিম সন্ত্রাসবাদের আখড়া। যাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, হচ্ছে বা ভয় দেখিয়ে ফেরার বানানো হচ্ছে, তারা সবাই নাকি ইণ্ডিয়ান বা জামাতুল বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী! গরিব ঘরের ধৃত বছর উনিশ-কুড়ির বিবিরা নাকি পর্দানসীন হলে হবে কি হাড় হিম ধরানো সন্ত্রাসী মানসিকতায় কট্টর! তারা নাকি এখানে আজমগড় মডেলে ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনার কথা কবুল করেছে! বলেছে আল কায়দার সাথে গোপন যোগাযোগ সাটগাট থাকার কথা!

আসলে এ সবই শুনতে হচ্ছে কেন্দ্রের গোয়েন্দা পুলিশের মুখের ভাষায়। ধৃত বা ফেরারদের মুখ থেকে সরাসরি সবকিছু জানার স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক সুযোগ নেই। গোয়েন্দা পুলিশের দল যখন হানাদারিতে ঢুকছে, সে বাড়ি-গাড়ি বা মাদ্রাসা যেখানেই হোক, কি নিয়ে ঢুকছে তার কোন স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষপ্রমাণ নথিভুক্ত করছে না; আবার বস্তা-বাক্স বা পুটলি ইত্যাদি নিয়ে যখন বের হচ্ছে তার সীজার লিস্ট স্থানীয় নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক তদারকিতে হচ্ছে না। ধৃতদের আইনের সাহায্য পাওয়ার অধিকার কার্যত হরণ করা হচ্ছে আইনজীবী মহলের প্রতি হিমশীতল শাসানির চাহনি সংকেত ছুঁড়ে দিয়ে। একজন দোষী সন্দেহ হলে তার নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, আইন-আদালত মেনে বিচার হওয়ার দরকার। কিন্তু খাগড়াগড়কাণ্ডের ইস্যুতে কেন্দ্রের গোয়েন্দা অভিযান যেভাবে চলছে তার নিরপেক্ষতা আদৌ স্বচ্ছ থাকছে না, বরং একটি নির্দিষ্ট আগ্রাসী মতাদর্শগত-রাজনৈতিক প্রবণতার খোরাক যোগাতেই যেন পক্ষপাতদুষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। মিডিয়ার মোদী-বিজেপি ভজা অংশগুলোও পরবর্তী ‘বিকল্পের’ জমি তৈরী করতে নির্লজ্জ দু’কানকাটা বেহায়ার মতন নেমে পড়েছে। তারা ‘সন্ত্রাসের সাত-সতেরো’ মানচিত্র আঁকছে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আগমনী মানচিত্র নির্মাণের বেপরোয়া সেবকের মতই। এতো আদিখ্যেতা তো সন্দেহ জাগায়ই। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বলছেন, সব মুসলিম শত্রু নয়, শত্রু যত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা। এই ধুয়ো তোলার একটাই উদ্দেশ্য—৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো—সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে আড়াআড়ি ভাঙ্গন ধরানো। হয় বিজেপিকে ভোট দাও, নয়তো ‘সন্ত্রাসবাদী বাংলাদেশী’ সন্দেহ ছড়ানো হবে।

এভাবে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এক ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী প্রচার কুৎসা জিগিরের সম্মুখীন। এর সামাজিক-রাজনৈতিক মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ জোরদার রাখতে হবে।

‘প্রেম জিহাদ’ নিয়ে গালগল্পর আসল উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক-পিতৃতান্ত্রিক ঘৃণা ছড়ানো

যাকে ভিত্তি করে বিজেপি ও সংঘ পরিবার ‘প্রেম জিহাদ’-এর বিদ্বেষমূলক প্রচার চালায় তা সম্প্রতি পুরোপুরি মিথ্যা বলে উন্মোচিত হয়েছে। মীরাটের যে তরুণীকে ‘প্রেম জিহাদ’-এর শিকার বলে বলা হয়েছিল সে পুলিশের কাছে গিয়ে সত্যিটা খুলে বলেছে। আর সত্যিটা হল এই যে, সে আসলে পরিবার ও সমাজের পিতৃতান্ত্রিক চাপের এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল।

হিন্দু পরিবারের মেয়ে হয়ে সে একটি মুসলিম ছেলেকে ভালোবেসেছিল, তাকে বিয়ে করেছিল ও গর্ভবতী হয়েছিল, আর এর জন্যই তাকে পরিবার ও তার সম্প্রদায়ের রোষের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এবং অতি পরিচিত এই বিষয়টাকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারিরা ঘৃণা ছড়ানোর কাজে লাগিয়েছিল। ‘প্রেম জিহাদ’-এর গাল-গল্পকে পল্লবিত করতে প্রেমের এক আখ্যানকে বিকৃত করে পরিণত করা হয়েছিল ঘৃণা ছড়ানোর এক উদ্যোগে। প্রেম, দুজনে পালিয়ে যাওয়া ও বিয়ে করার ঘটনাকে বিকৃত করে তাকে ধর্ষণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরণ বলে দাবি করা হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ দশজন নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যেতে হয়েছিল, ঐ তরুণীকেও মুখোমুখি হতে হয়েছিল নিদারুণ জুলুম ও হুমকির।

আমরা ধারাবাহিকভাবে বলে এসেছি যে, ‘প্রেম জিহাদ’ নিয়ে বিজেপির প্রচার যেমন সংখ্যালঘুদের নিপীড়িত করে, তেমনি নারীরাও তার নিগ্রহের শিকার হয়—এবং মীরাটের ঘটনা এই বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পারস্পরিক মন দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মধ্যে নারী ও পুরুষের প্রেমকে নারীর অভিভাবকরা প্রায়শই ধর্ষণ বলে ছাপ মেরে দেয়। দিল্লীতে ধর্ষণ সম্পর্কিত বিচারগুলোর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, একেবারে ৪০ শতাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করেছে সেই সমস্ত মেয়ে বা নারীর বাবা-মায়েরা যে মেয়েরা তাদের প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনাতেই মেয়েদের যে হিংসার মুখোমুখি হতে হয়েছে তা তার পরিবার বা সম্প্রদায়ের হাতে এবং এ সবই হয়েছে ‘সম্মান’-এর নামে। আর যে সমস্ত প্রেমিক জাত-পাত বা সম্প্রদায়ের গণ্ডি ভাঙ্গে তাদের ‘সম্মান’ হত্যা ভারতে ব্যাপক সংখ্যায় ঘটে চলেছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্দেহের মনোভাব ও ঘৃণা উসকিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ‘প্রেম জেহাদ’ নিয়ে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের প্রচার এই সমস্ত ‘সম্মান’-এর নামে অপরাধে, জোরজুলুমে রাজনৈতিক প্ররোচনা যোগায় এবং নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তোলে। বিজেপির বেশ কিছু বড় নেতা প্রকাশ্যেই ‘প্রেম জিহাদ’ নিয়ে প্ররোচনা সৃষ্টি করেছেন; বিজেপি নেতারা ‘গর্ব’ নাচ ঘরে মুসলিম পুরুষদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন; বিজেপির ছাত্রশাখা এ বি ভি পি ‘প্রেম জিহাদের’ বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে প্রচারাভিযান শুরু করেছে এবং আর এস এস-এর মুখপত্রগুলো প্রথম পাতায় উসকানিমূলক প্রতিবেদন ছেপে ‘প্রেম জিহাদের’ গালগল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

প্রতিটি পুরুষ ও নারীর তাদের পছন্দের সঙ্গীকে ভালোবাসা, বিয়ে করা ও তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে। এই অধিকার ভারতের সংবিধানে সুরক্ষিত। ভারতের শাসক দল এই অধিকারগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারকে সমর্থন করলে এবং নিজেই ঐ ধরণের প্রচর চালালে সাধারণ মানুষের, নারীদের এই অধিকার কিভাবে সুরক্ষিত হবে? আজকের ভারতে কোন নারী ভিন্ন জাত বা সম্প্রদায়ের কোন পুরুষকে ভালোবাসার অধিকারের সুরক্ষার জন্য সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর ভরসা করতে পারে না। হিন্দু নারীর সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ কোন মুসলিম বা খ্রিষ্টান পুরুষ, বা যে কোন নারীকে ভালবাসার জন্য কোন দলিত পুরুষও তার ও তার প্রেমিকার অধিকারের সুরক্ষার জন্য এই সরকার ও রাষ্ট্র যন্ত্রের উপর ভরসা রাখতে পারে না। পুলিশ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকেও জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীপতিদের সংস্কারগ্রস্ত মনোভাবের অংশীদাররূপে দেখা যায়। আর এখন ভারতের বর্তমান শাসক দল তার রাজনৈতিক প্রভাবকে বাড়াতে ‘প্রেম জিহাদ’-এর গালগল্পকে ছড়াচ্ছে এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকে উসকিয়ে তুলে এবং নারীর স্বাধীনতাকে খর্ব করে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাচ্ছে।

সম্প্রতি বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে সংঘ পরিবারের উন্মত্ত জনতার চাপে পুলিশ এক বিবাহিত দম্পতিকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াসী হয়, কারণ স্বামী হল খ্রিষ্টান আর স্ত্রী হিন্দু। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নারীদের, ভিন্ন জাতে বিয়ে করা দম্পতিদের অধিকারের সুরক্ষাকে অনেক বেশি কঠিন করে তুলেছে। পরিস্থিতি এইরকম হওয়ায় বর্তমান বিশেষ বিবাহ আইনের সংশোধন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, যে আইনের অধীনে বর্তমানে ভিন্ন ধর্মে বিবাহের অনুমতি রয়েছে। আইনের বর্তমান ধারা অনুযায়ী এক মাসের একটি সময়কাল থাকে যে সময়ের মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত পুরুষ ও নারীর বাবা-মায়েদের বিষয়টি জানানো হয় এবং তাঁরা প্রস্তাবিত বিবাহে আপত্তি জানাতে পারেন। এক মাসের সময়কাল চাপ সৃষ্টি ও জুলুম চালানোর সুযোগের দ্বার খুলে দিচ্ছে, ফলে ঐ ধারার বিলোপ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সারা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক-পিতৃতান্ত্রিক প্রচারের যোগ্য জবাব দিতে হবে, নিজেদের পছন্দমত ভালোবাসা ও বিয়ে করার সমস্ত মানুষের অধিকারকে সাহসের সাথে তুলে ধরতে ও সম্মান জানাতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয় ১৪ অক্টোবর ২০১৪)

বীজপুরে ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে প্রগতিশীল মহিলা সমিতির থানা ডেপুটেশন

উত্তর ২৪ পরগণার বীজপুর থানার ঘাসবাটি অঞ্চলে গত ৪ অক্টোবর খুব স্বাভাবিক প্রকৃতির নয় এমন একটি মেয়েকে স্থানীয় এক যুবক রাস্তা থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে নিজের গাড়িতে তুলে নিজেরই বাড়িতে নিয়ে যায় এবং ভয় দেখিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে। মেয়েটি বাড়িতে ফিরে প্রথমে ভয়ে কাউকে কিছু বলে নি। দিন তিনেক পর অবশ্য সবকিছু খুলে বাড়িতে বলে। তারপর এলাকায় জানাজানি হয়। পরদিন ঐ অঞ্চলের মহিলা প্রতিনিধি দল মেয়েটির বাড়িতে যান, তাঁরা বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। মেয়েটির নাম প্রকাশে আপত্তি থাকলেও মেয়ের বাবা প্রতিকার চাইতে থানায় যেতে চান এবং প্রগতিশীল মহিলা সমিতিকে সহযোগিতা করার কথা বলেন। সেইমতো মেয়েটির বাবার সঙ্গে মহিলা সমিতির বীজপুর ও ঘাসবাটি এলাকার সদস্যরা থানায় গিয়ে ডেপুটেশন দেন। দাবি করা হয়েছে, দোষীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে, মেয়েটির পরিবারকে কোনরকম ভয় দেখানো চলবে না, এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের টহলদারির ব্যবস্থা করতে হবে। সমিতির নেতৃত্ব দেন প্রণতি নাথ, রেবা সর্দার, শান্তি দাস, অনিতা চক্রবর্তী ও ঝুম্পা দাস। গত ১৯ অক্টোবর ধর্ষিতা মহিলার বাড়িতে এক প্রতিনিধিদল দল গিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অর্চনা ঘটক, মৈত্রেয়ী বিশ্বাস এবং শান্তি দাস। ওঁনারা ঐ মহিলার বাড়িতে গিয়ে ওঁনার সাথে কথা বলেন, উনি মানসিক ভারসাম্যহীন এবং মেধার প্রশ্নেও দুর্বলতা আছে। যে মেডিকেল টেস্ট করা হয় সেখানে পরিবারের লোকজনকে থাকতে দেওয়া হয় না, এমনকি নিজেদের পক্ষ থেকেও আইনজীবী দেওয়া সম্ভব হয়নি, সরকারি আইনজীবিই মামলাটির দেখভাল করছে। পরে স্থানীয় সরকার বাজার অঞ্চল থেকে এক প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করা হয়।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ আই এস এ-র আত্মঘোষণা

(আজকের দেশব্রতীর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় আমরা দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে চারটি কার্যনির্বাহী পদেই এ আই এস এ-র বিজয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভালো ভোট পেয়ে (বিগত বছরের প্রায় দ্বিগুণ) তৃতীয় শক্তি হিসাবে এ আই এস এ-র উত্থানের রিপোর্ট ছেপেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপির বিজয় এবং তার ছাত্রশাখা এ বি ভি পি-র প্রতি মোদী ও বিজেপি নেতৃবৃন্দের মদতের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সাফল্য একেবারেই সহজ ছিল না, অনেক সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার পথ পেরিয়েই ঐ সাফল্য এসেছে। ঐ সাফল্যের নেপথ্যে এ আই এস এ-র সংগ্রামী ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সি পি আই (এম এল)-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র লিবারেশন, অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্লেষণের মধ্যে থেকে এই সংখ্যায় আমরা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই এস এ-র সংগ্রামের ইতিবৃত্তের কথা ছাপছি, পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এ আই এস এ-র সাফল্যের পিছনে থাকা সংগ্রামের পটভূমি। —সম্পাদকমণ্ডলী)

স্নাতক স্তরের তিন বছরের পাঠক্রমকে চার বছরের করে তোলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য সংগ্রাম

স্নাতক স্তরের তিন বছরের পাঠক্রমকে চার বছর করে তোলার বিরুদ্ধে এ আই এস এ ধারাবাহিক ও দৃঢ় প্রচার চালিয়েছে; পরিবহনে সাধ্যায়ত্ত ভাড়া ও থাকার বন্দোবস্তের জন্য বছরভর লড়াই চালিয়েছে; দিল্লীতে ধর্ষণ ও দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই সমস্ত সংগ্রামের জন্যই এ আই এস এ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থন পেয়েছে।

তিন বছরের পাঠক্রমকে চার বছর করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ আই এস এ গত একবছর ধরে লাগাতার যে সংগ্রাম চালিয়েছে, তার ফলে হাজার হাজার ছাত্রকে সে ঐ লড়াইয়ে সমাবেশিত করতে পেরেছে, এ বি ভি পি-এন এস ইউ আই জুড়ির ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরাতে সক্ষম হয়েছে এবং গত বছরই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে সে এক জোরালো শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বি ভি পি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে গত বছর বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও তিন বছরের পাঠক্রমকে চার বছর করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন লড়াই বা প্রতিবাদ করেনি, মাঝে মাঝে শুধু কিছু অসার বিবৃতি দিয়েছে। এ বি ভি পি যার ছাত্রশাখা সেই বিজেপির শিক্ষক শাখা এন ডি এফ টি তিন বছরের পাঠক্রমকে চার বছর করে তোলা সম্পর্কে দ্বিচারিতা দেখায়, এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন শিক্ষক ২০১৩-তে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের তিন বছরের পাঠক্রমকে চার বছর করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু এই বিষয়ে এ আই এস এ-র দৃঢ় নাছোড় সংগ্রাম—যে সংগ্রামে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিল—কংগ্রেস ছাড়া অন্য সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনকেই লোকসভা নির্বাচনের সময় মুখে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে বাধ্য করে এবং এইভাবে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ঐ সিদ্ধান্ত অবশেষে বাতিল হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

উপরোক্ত বিষয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি এ আই এস এ এবছরের গোড়া থেকে আর একটি প্রচারাভিযানও শুরু করে—যার নাম দেওয়া হয় ''আমাদের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়-আমাদের অধিকার-আমাদের লড়াই'' এবং সেটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়। ঐ প্রচারাভিযানে যে দাবিগুলো রাখা হয় তার মধ্যে ছিল—ব্যয়বহুল নয় এমন ভালো মানের শিক্ষা, পরিবহন ও থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। থাকার জায়গা, বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও বাসের যাতায়াতের জন্য পাস দেওয়া সম্পর্কে এ আই এস এ-র প্রচার এ বি ভি পি এবং এন এস ইউ আই-কে বাধ্য করে ঐ ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব দিতে। সম্ভবত এই প্রথমবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ঐ ইস্যুগুলোকে কারুর পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথমবার যে ইস্যুগুলোকে তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত করা হয়েছিল সেগুলো ছিল—সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিকীকরণ এবং যে সমস্ত বিষয় ছাত্রদের ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই সমস্ত বিষয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, যৌন নিগ্রহ ও বর্ণবাদী আক্রমণের মোকাবিলায় শক্তিশালী সংস্থা গঠন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নয়, সেখানে ক্যাম্পাসের জীবনধারা কেমন হবে তা নির্ধারণে সাধারণ ছাত্রদের কোন ভূমিকা নেই। এ আই এস এ এই বিষয়ে পরিবর্তন, যথার্থ গণতন্ত্র ও সর্বজনীনতার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এতদিন যে ধারা চলে আসছিল এ আই এস এ তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নির্দিষ্ট কিছু মুখের বদলে ইস্যুগুলো যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করেছে।

নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই

এ আই এস এ যখন ছাত্রদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গণতান্ত্রিকীকরণের জন্য আন্দোলন করছিল, এ বি ভি পি এবং এন ইউ এস আই তাদের এতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে খোলাখুলিভাবে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। তারা টাকা ও পেশি শক্তির অশ্লীল প্রদর্শনী করেছিল, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপি 'মেরি কম' সিনেমার টিকিট ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়েছিল এবং ছাত্রদের মধ্যে 'নাম লেখা কার্ড' বিতরণ করেছিল যার মধ্যে কোন ইস্যুর উল্লেখ ছিল না। এসব ছাড়াও এবারের নির্বাচনে এ বি ভি পি-র পোস্টারে সাধারণ সম্পাদকের পদে তাদের প্রার্থী কনিকা শেরাওয়াতের মুখ হিসাবে সুপরিচিত এক মহিলা মডেলের ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল যা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট কলঙ্কিত করেছিল!

অন্যান্য দিক থেকেও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন এক কঠিন লড়াই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে কলেজগুলো রয়েছে সেগুলো দিল্লী নগর বা রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ও দক্ষিণ ক্যাম্পাসের কলেজগুলো ছাড়া অন্য কলেজগুলো ছড়িয়ে রয়েছে দূরবর্তী এলাকায়—যেখানে ছাত্র রাজনীতিতে এখনও প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে স্থানীয় জাতপাত ও সম্প্রদায়গত সমীকরণ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং এন ইউ এস আই/এ বি ভি পি বা দিল্লীর শাসক শ্রেণীগুলোর যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে যথার্থ চ্যালেঞ্জ খাড়া করার অর্থ অবশ্যই হল দিল্লীর ব্যাপকতর অংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে কর্তৃত্বকারী প্রভাবশালী শক্তিগুলোর মোকাবিলা করা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে এ আই এস এ **৫৪টা** কলেজে প্রচার চালিয়েছে। এর মধ্যে দূরবর্তী গ্রামীণ দিল্লীর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কলেজ, অদিতি মহাবিদ্যালয় ছিল, আর ছিল শ্যামলাল কলেজ ও বিবেকানন্দ মহিলা কলেজ, নজফগড় এলাকায় ভগিনী নিবেদিতা কলেজ, নারাইনা এলাকার রাজধানী ও শিবজি কলেজ। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচার করতে গিয়ে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হয়েছে এ বি ভি পি এবং এন ইউ এস আই-এর অর্থ ও পেশি শক্তির, অঞ্চলগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জাতপাত ও সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে কর্তৃত্বকারী কায়েমী স্বার্থের শক্তিগুলোর।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই এস এ-ই হল একমাত্র শক্তি যে বছরের পর বছর ধরে একগুচ্ছ গণতান্ত্রিক ইস্যুতে লাগাতার প্রচার চালিয়ে আসছে—সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, খাপ পঞ্চায়েত ও নৈতিক দাদাগিরির বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, যৌন হিংসা, দুর্নীতি ও কর্পোরেট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে। এ বি ভি পি এবং দীর্ঘ শিকড় গেড়ে থাকা ক্ষমতার দালালরা এ আই এস এ-কে 'জাতীয়তা বিরোধী' বলে ছাপ মেরেছে, এ সত্ত্বেও ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বর্তমানের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক ইস্যুতে এ আই এস এ তার নীতিগত অবস্থানকে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছে।

এই পটভূমিতেই এসেছে এ আই এস এ-র এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এ বি ভি পি-র দিক থেকে 'মোদী ম্যানিয়া' ও 'সুদিন'-এর বুকনিকে বিকোনোর সার্বিক প্রয়াস সত্ত্বেও সম্ভবত এই প্রথম কোন বামপন্থী র‍্যাডিক্যাল শক্তি পরিবর্তনের লক্ষ্যে সারা দিল্লীর ছাত্রদের ব্যাপক অংশের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে—যে পরিবর্তন ছাত্র রাজনীতিতে এক সৃজনশীল ও গঠনমূলক মডেল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন নতুন ইস্যু ও ধ্যানধারণার পক্ষে দাঁড়ায়।

হালদারদীঘির ধর্মঘট ...

একের পাতার পর

অমর্যাদাকর প্রস্তাব খারিজ করে দেন। পক্ষান্তরে টি এম সি মার্কা কর্তারা বৃহত্তর শ্রমিক অসন্তোষের আশঙ্কাকে হেসে উড়িয়ে দেন।

ইজ্জতের প্রশ্নে জেগে ওঠে আদিবাসী জনতা, গড়ে ওঠে ব্যাপক শ্রমিক ঐক্য

সমিতির কর্তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হালদারদীঘি গ্রামের আদিবাসী সমাজ ও গরিব জনগণ ঘরে ঘরে আগামী আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে থাকেন। বিশেষ করে মহিলারা বাড়ী বাড়ী প্রচারের সাথে সাথে অর্থ সংগ্রহ শুরু করে দেন। প্রচারপত্র ছেপে অন্যান্য হিমঘরের শ্রমিক সহ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিলি করা হয়। ভালমাত্রায় পোস্টারিং করা হয়।

কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী সমবায় কর্তারা সহজে কথা শুনবে না বুঝে ধর্মঘটের প্রস্তুতি জোরদার করা হতে থাকে। বেশী দেরী করলে শেষ সময়ে বড় ব্যবসাদার ও স্টকিস্টদের আলু সব বেরিয়ে যাবে। পড়ে থাকবে শুধু ক্ষুদ্র চাষীদের আলু। ভিতরে ভিতরে তাই ধর্মঘটের দিন স্থির করে ফেলা হয়। স্থানীয় হিমঘরগুলোর ভারপ্রাপ্ত সিটু নেতাকে আন্দোলনে সংহতি জানানোর আহ্বান রাখা হয়। হালদারদীঘি হিমঘরের ১০০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন সুনিশ্চিত করা হয়।

নিশ্ছিদ্র ধর্মঘট ঃ স্নায়ুযুদ্ধে শ্রমিকরাই জিতলেন

কৌশলগত কারণে ধর্মঘটের দিন না জানিয়ে বেশ কিছু হাতে রেখে সমবায় কর্তৃপক্ষকে চরমপত্র দেওয়া হয়। বিডিও-কেও চিঠি দিয়ে বিষয়টি অবহিত করার সাথে সাথে শ্রম দপ্তরের কাছেও সমিতি কর্তাদের শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। ধর্মঘটের ঠিক আগের দিন ১৬ অক্টোবর বিকেলে মিছিল সহ হিমঘরের ভিতর বিক্ষোভসভা সংগঠিত হয়। সভায় পরদিন থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা করা হয়।

১৭ অক্টোবর সকাল ৮টায় হিমঘরের গেট খোলার যথেষ্ট আগে থেকেই হালদারদীঘি আদিবাসী জনগণ হিমঘরের সামনে অবস্থান শুরু করে দেন। কর্মচ্যুত শ্রমিকদের মা-বাবা-স্ত্রী এমনকি শিশু সন্তানদেরও অবস্থানে সামিল করানো হয়। হিমঘরের আলু বাছাইয়ের কাজে যুক্ত সমস্ত শ্রমিক সনাতন-রবীনকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে শ্লোগান দিতে থাকেন। স্থায়ী শ্রমিকরা ও অফিস স্টাফ সকলেই স্বেচ্ছায় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ম্যানেজার জোর করে হিমঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ আসে। ধর্মঘট তুলে নেওয়ার জন্য পুলিশের আবেদনে কর্ণপাত না করে আন্দোলনকারীরা একের পর এক মাইকে বক্তব্য রাখতে থাকেন। পার্টি নেত্রী সরস্বতী তুড়ি, জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, সি আই টি ইউ নেতা সাধন সর্দার লাগাতার ধর্মঘটের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অবশেষে পুলিশ উদ্যোগী হয়ে পাণ্ডুয়ার বিডিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সৎ অফিসার হিসেবে বিডিও শ্রীমতী নবনীপা সেনগুপ্তের ব্যতিক্রমী ভূমিকা শ্রমিকরা আগেও দেখেছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতিতে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়।

পরদিন ১৮ অক্টোবর সরকারি দপ্তরে ছুটি থাকা সত্ত্বেও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসে বিডিও শ্রমিকদের দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন। তাঁর চেম্বারের সামনে বহু আদিবাসী নারী-পুরুষের জমায়েত দেখে আন্দোলনের গণচরিত্র সম্পর্কে বুঝতে বিডিও-র কোন অসুবিধে হয়নি। তিনি সমবায় কর্তাদের নির্দেশ দেন—দুজন শ্রমিককেই অবিলম্বে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে। তাদের ১৫০ টাকার থেকে এক পয়সাও কম মজুরি দেওয়া চলবে না। তাদের প্রাপ্য বোনাস থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। সভায় পাণ্ডুয়া থানার ওসি পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নেন। সমবায় কর্তাদের দর্প চূর্ণ হয়। বিডিও-র নির্দেশ মাথা নিচু করেই তাদের মেনে নিতে হয়।

বীরের মর্যাদা নিয়েই রবীন-সনাতন কাজে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু লড়াইয়ে সব জয় হাসিল করা যায়নি। সমবায়ের কর্মী হিসেবে তাদের যে স্বীকৃতি তা আদায় করা সম্ভব হয়নি। কাজ তারা আগের মতই করে যাবেন কিন্তু সমবায় কর্মীর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য তাদের লড়াই জারি রাখতে হবে আরও অনেক অনেক দিন।

- মুকুল কুমার

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রায় ৪ মাসের ওপর ''আজকের দেশব্রতী''-র সম্পাদনা এবং ডি টি পি কাজের সেন্টার ক্রীক রো অফিস থেকে রাজাবাজার অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তাই পত্রিকায় যা কিছু ছাপার জন্য সবই সরাসরি ই-মেইল করে পাঠানোর নতুন উদ্যোগ শুরু করা দরকার। সম্পাদনার কাজ এবং ডি টি পি কাজের আবশ্যিক সুব্যবস্থার স্বার্থে এই নতুন ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করার জন্য একান্তভাবে আবেদন জানানো হচ্ছে।

—সম্পাদক।

e-mail : deshabrati@gmail.com

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

হোক কলরব ...

এ স্পেক্টর ইজ হানটিং ওভার আওয়ার ল্যাণ্ড—দি স্পেক্টর অফ হোক কলরব ... ২০ সেপ্টেম্বর '১৪ যাদবপুরে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে আছড়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের স্বতস্ফূর্ত মহামিছিল শাসকের কাছে যেমন ভূত দেখার মতই, তেমনি আমাদের কাছেও উদ্দীপনা ও আশার আলোর সাথে সাথে কিছু প্রশ্নও হাজির করেছে।

শুরু করা যাক মিছিলের অ্যানাটমি দিয়ে। যে কোনও অ্যানাটমি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে দুটি বিষয় সামনে আসে তা হল অ্যানাটমির ফরম ও কনটেন্ট এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের দিকগুলো। ফরমের আপাত হোমোজিনিটি ও কনটেন্টের হেট্রোজিনিটি বেশিরভাগ অ্যানাটমিরই একটি বৈশিষ্ট্য। এই মহামিছিলের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখলাম। নির্দিষ্টভাবে যাদবপুরে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমায়েত হওয়া হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর হোক কলরব শ্লোগান-এর আপাত ফর্মাল হোমোজিনিটি আসলে ছাত্রসমাজের মধ্যে জমে থাকা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ও জেণ্ডার ভায়োলেন্স-এর বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয়ে জমে ওঠা অবদমিত ক্ষোভ-বিক্ষোভের বিস্ফোরণ। তাই এর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই কনটেন্ট-এর হেট্রোজিনিটিকে। এই স্বতস্ফূর্ত হঠাৎ বিস্ফোরণের প্রস্তুতিপর্ব নানা দিক থেকে অনেক দিন ধরেই চলছিল।

খুব যান্ত্রিক মনে হলেও ব্যাখ্যার স্বার্থে আমরা এই মিছিলে আগত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ইস্যুর ভিত্তিতে মূলত তিন ভাগে ভাগ করতে চাই। এই তিনটি ইস্যুর বাইরে অন্য কোনো ইস্যু ছিল না সেরকম দাবি করছি না, বা একই ছাত্র একাধিক ইস্যু নিয়ে আসেনি এমনও দাবি করছি না, শুধু মিছিলে আগত বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে যা বোঝা গেছে তাতে নিম্নলিখিত তিনটি ইস্যু প্রধান।

ইস্যু নং ১ ঃ

জেণ্ডার ভায়োলেন্স এণ্ড জেণ্ডার জাস্টিস

যাদবপুরের আন্দোলন শুরুই হয়েছিল ক্যাম্পাসে ফেস্টের রাতে এক ছাত্রীর যৌন হেনস্থার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাজ্যজুড়ে নারীর উপর যে চরম অত্যাচার ও ধর্ষণের ঘটনাগুলো ক্রমবর্ধমান, তার বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ অনেকদিন ধরেই পুঞ্জিভূতি হচ্ছিল। কামদুনি থেকে মধ্যমগ্রাম, আসানসোল থেকে কোন্নগর, জগাছা থেকে যাদবপুর সর্বত্রই ধর্ষণের ঘটনাগুলোতে শাসকদলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই শাসকের এক চরম পিতৃতান্ত্রিক অবস্থানের মধ্যে ক্ষমতার আস্ফালনই লক্ষণীয়। এই মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশই এসেছিল এই আস্ফালনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে।

ইস্যু নং ২ ঃ ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাসগুলো আজ শম্ভু পণ্ডা ও আরাবুলদের পেশীশক্তি প্রদর্শনের জিমন্যাসিয়ামে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে পেশীশক্তি, স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে কলেজ ক্যাম্পাসগুলোকে এক দলতান্ত্রিক দাদাগিরির ঠেকে পরিণত করেছে শাসক দল ও তার ছাত্র সংগঠনটি। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জমানাতেও ক্যাম্পাসগুলোতে একইরকমভাবে এক দলীয় শাসন কায়েম হয়েছিল। 'পরিবর্তনের' পক্ষে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে যখন ব্যাপক ছাত্রসমাজ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল, তখন তারা আশা করেছিল নতুন জমানায় ক্যাম্পাসগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিধি 'বাম' বা দক্ষিণ যাই হোক, ক্যাম্পাস গণতন্ত্র এখনও দূর অস্ত। ইলেকশনের বদলে তাই আজও চলে সিলেকশন, ভর্তির সময় বা ফেস্ট-এর নাম করে ইউনিয়নের দাদাদের দ্বারা সংগঠিত হয় ব্যাপক লুঠতরাজ। ক্যাম্পাসের এই হেন অবস্থার বিরুদ্ধে এক জেহাদ ছিল এই মিছিলে। শ্লোগান উঠল "এই মিছিল, সেই মিছিল যে মিছিল দিচ্ছে ডাক, ক্যাম্পাসে দাদাগিরি নিপাত যাক" বা "আলিমুদ্দিন শুকিয়ে কাঠ, এবার লক্ষ্য কালিঘাট"।

ইস্যু নং ৩ ঃ প্রাইভেটাইজেশন অফ এডুকেশন

মিছিলে লক্ষ্যণীয়ভাবে একটি বড় অংশ ছিল, যারা এসেছিল বিভিন্ন প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে। তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলোর কথাও জানা গেল। মূলত ১৯৯৯ থেকে রাজ্যজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর হাল বেহাল। বেশিরভাগ কলেজে নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, নেই ঠিকঠাক ফ্যাকাল্টি। সেখানেও গণতন্ত্র খর্বিত, নেই স্টুডেন্ট ইউনিয়ন করার অধিকার। নয়া উদারবাদী জমানায় শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তৈরী হচ্ছে ব্যাপক ক্ষোভ বিক্ষোভ। মহামিছিলে তারাও অংশ নিয়েছে।

২০ মহামিছিলে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্রবন্ধু বলছিল, 'দিস র‍্যালি ইজ ইটসেলফ এ স্টেটমেন্ট ...' অবশ্যই এটি ছিল একটি প্রত্যুত্তর, যেমন সেটি যাদবপুরের অপদার্থ ভিসি-র বিরুদ্ধে তেমনি ছিল জেণ্ডার ভায়োলেন্স-প্রাইভেটাইজেশন-এর বিরুদ্ধে এবং ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের পক্ষে। এখানে ভি সি মহাশয় একটি আদর্শ আর্কিটাইপ। তিনি পিতৃতন্ত্র, ক্ষমতার আস্ফালনের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতীক, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে ব্যাপক ছাত্রদের দাবি আসলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ক্ষোভ-বিক্ষোভের উদ্‌গীরণ ঘটিয়েছে ঐতিহাসিক জমায়েতটির মধ্যে দিয়ে।

ছাত্রছাত্রীদের এই উপপ্লব, ছাত্র আন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সচেতন বাম ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোর সামনে এই স্বতস্ফূর্ত ক্ষোভকে সংগঠিত করাটাই এই সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সারা বিশ্বে বর্তমানে ঘটে চলা গণআন্দোলনগুলো আমাদের সামনে একই সঙ্গে উদ্দীপনা ও আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। মিশর থেকে ইউক্রেন—বিভিন্ন আন্দোলন যেমন একদিকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, তেমনি আমরা দেখছি আন্দোলনগুলোর মধ্যেকার বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেসব দেশে অতি দক্ষিণপন্থা এমনকি ফ্যাসিজমেরও জন্ম হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়েও এই সময় আমরা বিজেপি ও সংঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনগুলোর উত্থান দেখতে পারছি। 'বিকাশ পুরুষ' মোদীকে সামনে রেখে হিন্দু সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের জাল ছড়িয়ে পড়ছে দেশজুড়ে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে হয়ে উঠেছে এই সাম্প্রদায়িক হিন্দুবাদের নীল নকশার কেন্দ্রস্থল। ছাত্রদের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ-বিক্ষোভকে তারা তাদের সাংগঠনিক বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চাইবেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে দক্ষিণ বনাম দক্ষিণ (তৃণমূল বনাম বিজেপি) দ্বিজাতিকরণের আওতায় বেঁধে ফেলতে সচেষ্ট বর্তমানের মিডিয়া ও কর্পোরেট পুঁজি। বামপন্থাকে দেখানো হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক। আইসার মত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কাছে এই আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত শক্তিগুলোকে, বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্তরণ ঘটানোটাই এই সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

হোক কলরব নিছকই একটি শ্লোগান নয়, এর মধ্যে নিহিত আছে এই সময়ের যুগাভিলাষ। এ হল ক্ষমতার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের দাবিতে রুখে দাঁড়ানোর এক আজাদির লড়াইয়ের সূত্রপাত। কিন্তু নানা অভিলাষের অপমৃত্যু আমাদের যুগকে তাড়িত করে বেড়ায়। তবু যৌবন আছে নতুন বসন্তের অগ্রদূত হয়ে।

এগিয়ে চলা যাক কমরেড

- রণজয় সেনগুপ্ত

ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়ছে, বাজারে দাম চড়া, ধান সংগ্রহে রাজ্য পিছিয়ে কেন?

মমতা সরকার ২ টাকা কিলো দরে ২ লক্ষ গরিব মানুষকে চাল দেয় বলে দাবি করে। কিন্তু সেই চাল কোথায় কত পরিমাণে, অথবা গরিব জনতার কত অংশকে কত পরিমাণে, বিস্তারিত তথ্য জানার উপায় নেই। রাজ্য সরকারের দিক থেকে সেরকম কোন তথ্য প্রকাশনা ব্যবস্থা নেই। খাদ্যমন্ত্রীমশাই কেরামতি দেখানোর নম্বর পান মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। মানুষকে খাদ্যমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথাই হজম করতে হয়। সাধারণভাবে সরকারি প্রচার হল জঙ্গলমহল, সিঙ্গুর ইত্যাদি অল্পকিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঐ ২ টাকার চাল দেওয়া হয়। এবার নাকি এর কোটা আরও ১ লক্ষ বাড়ানো হবে। অর্থাৎ এর আওতায় আসবে ৩ লক্ষ গরিব মানুষ। উত্তরবঙ্গে চাল বিলির সফরে মুখের কথায় জানালেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীমশাই।

এছাড়া মাঝেমধ্যে কিছু প্রতীকি চাল বিলি করে সরকার বিনামূল্যে। বেশ জাঁকজমক দেখিয়েই দাতব্যের প্রদর্শন হয়। এই সেদিন যা করা হল 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' পালন করতে। ঘটা করে 'খাদ্য দিবস' উদ্‌যাপনের যে কি মাহাত্ম! খাদ্যের দরকার রোজই। কিন্তু গরিব ক্ষুধার্তের পেট প্রায়শই থাকে ভুখা-আধপেটা। সরকারপক্ষের কেন্দ্রীয় স্তর থেকে 'খাদ্য সুরক্ষা আইন' চালু করে দেওয়া হয়েছে ছ'মাসের ওপর। যদিও সেই আইনে অনেক গোঁড়ো। তবু পশ্চিমবঙ্গকে কি ঐ অত্যাবশ্যকীয় সুরক্ষা আইন কার্যকরি করে তুলতে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে! খাদ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ। মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও কোন কথা নেই। তার বদলে পছন্দ হল 'দিবস' পালনের ভড়ং দেখানো, বেশ ঢাক পিটিয়ে কিছু আনুষ্ঠানিক দায় সেরে ফেলা। সেভাবেই 'খাদ্য দিবসে' খাদ্যমন্ত্রী খাদ্য বিলির সফর সারলেন। সামনে-পেছনে ছিল পুলিশ-প্রশাসনের কনভয় মিছিল। ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের তিনটি এলাকা—টোটোপাড়া, ঢেকলাপাড়া, রেডব্যাঙ্ক। দীর্ঘকাল বন্ধ থাকা এই চা বাগান এলাকা অনাহার আর মৃত্যু মিছিলে ছেয়ে গেছে। 'পরিবর্তনের' ধ্বজাধারী সরকার কোনই পরিবর্তনের শর্ত তৈরী করতে পারেনি। না পেরেছে রোজগারের অবস্থা পুনরুদ্ধার করে দিতে, না করেছে অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্ব পালন। না করে আসার ধরনই বুঝিয়ে দেয় এসব গুরুত্ব দেওয়ার তালিকায় নেই। অথচ অনেকবেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় টলিউডের বিত্তশালীদের বা কোনও ক্রিকেট কোম্পানীকে বিস্তর উপঢৌকন পাইয়ে দিতে।

এখন মমতা সরকার ২ টাকার চাল দেওয়ার প্রাপক-কোটা বাড়াবে বলছে। যদিও লক্ষ্যমাত্রাটা মোট গরিব জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য মাত্র। বি পি এল তালিকা তৈরীতে একদিকে শাসকের দায় কমানো এবং অন্যদিকে ভোটব্যাঙ্কের দলবাজীর স্বার্থে কারচুপি করা হয়েছে যথেচ্ছ। তাই বহু গরিব থেকে গেছেন বি পি এল তালিকার বাইরে। খোলাবাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেমন চড়া ছিল তেমনই থাকছে। মূল্যবৃদ্ধির গড় হিসাবটা ২০১২-১৩-তে ছিল ৯.০১ শতাংশ। ২০১৩-১৪-তে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩.০২ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত বছরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল অনেকটাই—৪.০১ শতাংশ। চলতি আর্থিক বছর (২০১৪-১৫) এখন সবে অর্দ্ধেক পেরোচ্ছে, মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি দাবি হল; পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার কমছে। একটু একটু করে। সেপ্টেম্বরে কমেছে ২.৩৮ শতাংশ। এটা নাকি গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে কমার রেকর্ড। তবে সরকারি পরিসংখ্যানে অন্যান্য কিছু খাদ্যদ্রব্যের কত শতাংশ মূল্য কমল তা উল্লেখ থাকলেও, চালের দাম কি কমল তার উল্লেখ নেই। খোলাবাজারে চালের দাম কমার চিহ্ন নেই। অর্থাৎ চালের দাম কমেনি। এমনকি আলুর দাম বেড়েছে ৯০.২৩ শতাংশ।

খোলাবাজারে চালের দাম চড়া থাকার কারণে চালের জন্য গরিব-গরিবতম মানুষেরা তো বটেই, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষেরাও নির্ভর করেন সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থার উপর। গণবন্টন ব্যবস্থায় চাল সরবরাহের কোটা চার বর্গের—অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয়, বি পি এল, এ পি এল।

রেশনে চাল দিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রের বাৎসরিক কোটা বরাদ্দ ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন। আর এবছর সরকারের চাল কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। রেশনে যা দিতে হবে তার চেয়ে ৪০ হাজার মেট্রিক টন বেশী মাত্র। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন কম সংগ্রহ হওয়া মানে প্রায় ২৫ শতাংশের মতন সংগ্রহে ঘাটতি (এইসময় ঃ ১৪ অক্টোবর '১৪)। আবার অন্য একটা তথ্যসূত্র মতে, এরাজ্যে সারা বছরে রেশনে সরবরাহের জন্য প্রয়োজন ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন। (গণশক্তি ১৫ অক্টোবর '১৪) তাইই যদি লাগে তাহলে তো রেশনে প্রয়োজনের তুলনায়ই ধানের সংগ্রহের পরিমাণ কম হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন। আর এই চালও তো খোলাবাজার থেকে আরও বেশি দামে কিনে দিতে হবে। ৩ লক্ষ লোককে ২ টাকার চাল দিতে হলে তো খোলা বাজার থেকে আরও চাল কিনতেই হবে। তার জন্য বাড়তি খরচ পড়বে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। সংগ্রহ যখন হয়নি, তখন খোলাবাজার থেকে তো কিনে দিতেই হবে। মমতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর অন্য পাঁচ রকমের বাজে খরচ কম বাড়েনি। নানা মোচ্ছবে প্রচুর টাকা ওড়ানো হয়ে আসছে। যে কারণে ২০১৩-১৪-র আর্থিক হিসাবে ঘোষিত ঘাটতির আগাম উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে ৩৪৮৮ কোটি টাকা, সেখানে বাস্তবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ১৬,৪৭০ কোটি টাকা (আনন্দবাজার, ৬ আগস্ট '১৪)। এখন ২ টাকায় চাল বিতরণের জন্য ঘাটতি যদি বাড়েও তা দিতেই হবে। তবে মোচ্ছবের খরচ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া উচিত।

তবে এখানে একটা সঙ্গত প্রশ্ন ওঠার। চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এক-চতুর্থাংশ মার খেল কেন? সেটা না হলে তো খোলাবাজার থেকে চড়া দামে চাল কেনার কোষাগারীয় মাশুল গুণতে হোত না। সংগ্রহ মাত্রা গুরুতরভাবে কম হওয়ার প্রথম কারণ হল, কেন্দ্র রেশনের জন্য সরাসরি ধান কেনার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্থির করেছিল কুইন্টাল প্রতি ১২৫০ টাকা। যেটা চাষের খরচের তুলনায় অনেকটা কম। এর উপর আরও কমপক্ষে ৩০০-৩৫০ টাকা সহায়ক মূল্য যুক্ত করার দরকার ছিল। যে প্রয়োজনটা এমনকি ছত্তিশগড়ের রামন সিং সরকারও স্বীকার করতে এবং কেন্দ্রের মোদী সরকারকে তা দেওয়ার জন্য দাবি করেছিল। শুধু তাই নয়, ঐ রাজ্যে রেশনে যে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন চালের কোটা আবশ্যিক, তা ছাড়াও বাকী যে ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপন্ন হয় তা এতদিন এফ সি আই কিনে নিত। এবার সেখানে রেশনের কোটার দায় সারার বাইরে অতিরিক্ত চাল এফ সি আই কিনবে না বলে কেন্দ্র নির্দেশিকা দিয়েছে। রামন সরকার ঐ নীতি প্রত্যাহারের দাবি জানাতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকার, যে কীনা কৃষকের জমির ইস্যুর উপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতায় এসেছে, সে সহায়ক মূল্যের উপর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রকে চাপে ফেললো না কেন, সেইসঙ্গে নিজেরা সহায়ক মূল্য

আটের পাতায় দেখুন

ক্যাগের কোপে রাজ্য
নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলের টাকা নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও গরমিল

রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলের কোটি কোটি টাকা নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও গরমিলের জন্য ক্যাগের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ পরীক্ষার পর ২০১৪ সালে ক্যাগের তরফ থেকে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। সেখানে ভুরি ভুরি ঘটনাকে তুলে ধরে দেখানো হয়েছে হতদরিদ্র নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে নির্মাতাদের কাছ থেকে সেস্ আদায় করে যে তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে তা নিয়ে হয়েছে ব্যাপক পরিমাণে অনিয়ম ও গরমিল।

২০১৩-র মার্চ পর্যন্ত, বোর্ড (নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণমূলক বোর্ড)-এর কাছে **৯ কোটি ২০ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিক নথিভুক্ত হয়েছেন** এবং বোর্ড যে সেস্ সংগ্রহ করেছে তার পরিমাণ **৫৩০.৪২ কোটি টাকা**। সেস আদায়ের নিয়ম হল নির্মাণ কাজে যুক্ত নির্মাতাদের সমগ্র নির্মাণ খরচের ওপর (এর মধ্যে জমির দাম এবং শ্রমিককে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা ধরা হয় না) ১ শতাংশ সেস্ দিতে হবে। ১০ লক্ষ টাকা বা তার উপর নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি রয়েছে। কত পরিমাণ সেস্ দিতে হবে তার মূল্যায়ন করার জন্যও আইন মোতাবেক একটা পদ্ধতি স্থির করা আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোতে নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োগকর্তার কাছ থেকে উৎসস্থল থেকেই তা আদায় করা হয়, আর বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে **অগ্রিম** সেস্ আদায় করার জন্য দায়বদ্ধ রয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ, পুরসংস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সেস্ আদায়ের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার বা এ এল সি দায়বদ্ধ। সেস্-র পরিমাণ কত হবে, তা পরিমাপ বা মূল্যায়ন করার জন্য সরকারি বিধি অনুযায়ী একটি ফর্ম রয়েছে, যেখানে নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। ক্যাগ রিপোর্টে দেখিয়েছে যে, **১৬,৪২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নিয়োজিত নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন মূল্যায়নই করা হয়নি।** ফলে ঐ বিশাল পরিমাণ টাকা ফাঁকি দিয়ে সংস্থাগুলো তাদের নিজেদের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সেস্ জমা করেছে। ফলে লক্ষ-কোটি টাকা বৈধ সেস্ আদায় থেকে বঞ্চিত হল নির্মাণ শ্রমিকদের বোর্ড।

বেসরকারি সংস্থাগুলোতেও একই ঘটনা ঘটেছে। নির্মাণ কাজে অনুমোদন দেওয়ার সময় স্থানীয় পুরসংস্থা, পঞ্চায়েত ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যে সমস্ত আবেদনপত্র পায়, তার ভিত্তিতেই অগ্রিম সেস্ আদায় করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ম পুরোপুরি লঙ্ঘন করা হয়েছে। **ক্যাগ রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে ২০০৯-১৩-র মধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রের অধীনে গোটা নির্মাণ কাজের মোট সেস্-র মাত্র ৪ থেকে ৮ শতাংশ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য সরকার।** ক্যাগ আরও দেখিয়েছে যে, বোর্ড গড়ে ওঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকাধীন ক্ষেত্রগুলোর কাছ থেকে ৩৭.৩৫ কোটি টাকা আদায় করেছে, যা সমগ্র সেস্ আদায়ের মাত্র ৮ শতাংশ। সেস্ আইন ১৯৯৬ অনুযায়ী তারা ঠিকঠাক সেস্ দিয়েছে কিনা তাও সরকার খতিয়ে দেখেনি; কোন কোন ক্ষেত্রে কত কোটি টাকা কম দেওয়া হয়েছে তা জানার জন্য সরকার আজ পর্যন্ত স্বাধীন কোন ব্যবস্থাপনাও গড়ে তোলে নি।

এ ব্যাপারে ক্যাগ দুটি উদাহরণ তুলে ধরেছে—

(১) ২০০৬-১৩ পর্যন্ত এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া (এ এ আই) দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কন্ট্রাক্ট প্রথায় ২৩২৫ কোটি টাকার বিনিয়োগে নতুন একটি টার্মিনাল গড়ে তুলেছে। উল্লিখিত পর্যায়ে নির্মাণ কাজের জন্য প্রকৃত কত পরিমাণ সেস্ এ এ আই-কে দিতে হবে তা নিরূপণ করার কোন বিধি ব্যবস্থা না থাকায় তারাই নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২৩.২৫ কোটি টাকা সেস্-র পরিমাপ করে। কিন্তু মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত এ এ আই মাত্র ১৫.৮৭ কোটি টাকা জমা দেয়, ফলে তাদেরই হিসাবমত মোট প্রাপ্যের থেকে ৭.৩৮ কোটি টাকা কম হয়। কম টাকা জমা দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এ এ আই-র কাছ থেকে কোন লিখিত জবাবদিহি চাওয়া হয়নি।

(২) শহরাঞ্চল কে এম ডি এ হরেকরকম পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালে এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য কে এম ডি এ ৯৩৩.৯৯ কোটি টাকা খরচ করে, আর এর জন্য বিধিসম্মতভাবে তার দেয় সেস্-র পরিমাণ হয় ৯.৩৪ কোটি টাকা। কিন্তু কে এম ডি এ ৭.৪৪ কোটি টাকা জমা করেছে; ১.৯০ কোটি টাকা মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সে জমা করেনি। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফ থেকেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সেস্ আইন অনুযায়ী, কম পরিমাণে বা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেস্ না দিলে নির্মাণকারীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো তা না করে নির্মাণকারীদের স্বার্থরক্ষা করার কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়েছে নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলে।

তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে চরম গাফিলতি

সেস্ জমা করার জন্য বোর্ড মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ৫৫টি অ্যাকাউন্ট এবং প্রশাসনিক খরচ চালাতে ৬৫টি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করত। এরই পাশাপাশি আঞ্চলিক লেবার অফিস বা আর এল ও স্তরে স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে ৬০টি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা হত। শ্রমিকদের দেয় চাঁদা, নথিভুক্তির চাঁদা জমা করার জন্য ২০০৬-এর জানুয়ারি মাসে স্টেট ব্যাঙ্কের মূল কলকাতা শাখার একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। ক্যাগ তার রিপোর্টে দেখিয়েছে যে তহবিল পরিচালনার গোটা প্রক্রিয়াটাই নানান গলদে ভরা, ঠিক সময়ে ব্যাঙ্কে টাকা না পাঠানো, তহবিলের অ্যাকাউন্টে টাকা না রেখে তা অন্য কোথাও রাখা, তহবিল পরিচালনায় চরম অদক্ষতা প্রভৃতি কারণে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। **ক্যাগ তার রিপোর্টে দেখিয়েছে যে ১৯টি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা না রাখায় ২.১৮ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, সেস তহবিল ঠিক সময়ে না পাঠানোর ফলে ১.১১ কোটি টাকা কম সুদ পাওয়া গেছে। আর বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থার** (এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও রয়েছে) **কাছ থেকে ৪.১৪ কোটি টাকার যে সেস আদায় হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত উশুল হয়নি। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ব্যাঙ্কে টাকা না থাকায়, স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির স্বাক্ষরে গোলমাল, চেকের সময়সীমা অতিক্রম করে যাওয়া** (প্রভৃতি কারণে) **৪.১৪ কোটি টাকা উদ্ধার করা যায়নি।**

কল্যাণমূলক খাতে তহবিলের খরচ

আইন অনুযায়ী কল্যাণমূলক খাতে নির্মাণ শ্রমিকদের তহবিল দুটো ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। একটি হল—বিধিবদ্ধ প্রকল্প এবং অপরটি অ-বিধিবদ্ধ প্রকল্প। বিধিবদ্ধ বা স্ট্যাটুটারি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধকালীন পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত কারণে নির্মাণ শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, মৃত্যু হলে এককালীন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, গৃহনির্মাণ, সন্তানদের শিক্ষাখাতে অনুদান, চিকিৎসা খাতে ব্যয়, প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ অ-বিধিবদ্ধ প্রকল্প বা নন্ স্ট্যাটুটারি বেনিফিটের মধ্যে রয়েছে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে আর্থিক অনুদান, বিবাহকালীন সহায়তা, যন্ত্রপাতি, সাইকেল, চশমা ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রভৃতি।

সেস্ আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, একবছরে মোট আদায়িকৃত সেসের ৫ শতাংশের বেশি প্রশাসনিক খাতে খরচ করা চলবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে তৃণমূল সরকার এই নিয়মের কোন তোয়াক্কা না করে প্রশাসনিক খাতে বিপুল ব্যয় করেছে। কিভাবে? ক্যাগ রিপোর্ট জানাচ্ছে যে,

(১) **২০০৯-১২ সালে মোট আদায়িকৃত সেস ৩৩৪.৭৭ কোটি টাকার মধ্যে বোর্ড শ্রমিকদের কল্যাণমূলক খাতে ৩৯,৭২৫ শ্রমিকের জন্য ব্যয় করে ৮.৬৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রশাসনিক খাতে খরচ হয় ২.৯৪ কোটি টাকা অর্থাৎ সমগ্র ব্যয়ের ৩৪ শতাংশ!** নীচের তালিকায় চোখ রাখা যাক—

সাল	মোট আদায়িকৃত সেস কোটি টাকায়	শ্রমিক কল্যাণ খাতে খরচ কোটি টাকায়	প্রশাসনিক খরচ ও শতাংশ হার
২০০৯-১০	৮৪.৪৭	৫৩২ শ্রমিকের জন্য ০.২২	০.১৮ কোটি টাকা ৮২ শতাংশ
২০১০-১১	৯০.২৫	৬৮৪৭ শ্রমিকের জন্য ১.৫৪	১.১৪ কোটি টাকা ৭৪ শতাংশ
২০১১-১২ (অসম্পূর্ণ)	১৬৪.০৫ (অসম্পূর্ণ)	৩২,৩৪৬ শ্রমিকের জন্য ৬.৯৩ (অসম্পূর্ণ)	১.৬২ কোটি টাকা ২৩ শতাংশ (অসম্পূর্ণ)

অর্থাৎ ২০০৯-১২ পর্যন্ত মোট আদায়িকৃত সেসের মাত্র ৩ শতাংশ নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণমূলক খাতে খরচ হয়েছে, আর বিপরীতে (মোট আদায়িকৃত সেসের ৫ শতাংশের বেশি প্রশাসনিক খাতে খরচ হবে না) সমস্ত নিয়মকে ভেঙ্গে **প্রশাসনিক খাতে খরচ হয়েছে বার্ষিক ২৩ থেকে ৮২ শতাংশ হারে!**

নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা খাতে তহবিল খরচ করার অগ্রাধিকার দিতে হবে—এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশিকা ছিল। এর মধ্যে রয়েছে, পেনশন তহবিল গঠন করা, গৃহনির্মাণ, শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর প্রকল্প, তাদের সন্তানদের জন্য তহবিল প্রভৃতি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিধিবদ্ধ খাতে তহবিল খরচ না করে তার সিংহভাগই ব্যয় করা হয়েছে অ-বিধিবদ্ধ প্রকল্পে (যেমন সাইকেল, চশমা, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনার জন্য)। আর ২০১১-১২ সালে শেষোক্ত খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৯ শতাংশ।

অ-বিধিবদ্ধ প্রকল্পে টাকা খরচের ক্ষেত্রেও নানা গরমিল উল্লেখ করা হয়েছে ক্যাগ রিপোর্টে। ৫৩৯১টি ভাউচারকে অডিট করে দেখা গেছে যে, ২০১৩ ক্ষেত্রে (যেখানে সাইকেল, যন্ত্রপাতি, চশমা প্রভৃতি কেনা হয়েছিল) কোন ধরণের রসিদ পাওয়া যায়নি। যার মূল্য ৩৯.৫২ লক্ষ টাকা। আবার, উলুবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, আলিপুর, বারুইপুর—এই চারটি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের অধীনে ৯২টি ক্ষেত্রে হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি টাকা বণ্টন করা হয়েছে। **নির্মাণ শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি, চশমা প্রভৃতি কেনার পর যে সমস্ত নথিপত্র সরকারের ঘরে জমা দিয়েছিল তার মোট মূল্য হয় ১.৪৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে ১.০১ লক্ষ টাকা বেশি বণ্টন করা হয়েছে!** অর্থাৎ ব্যয় করা হয়েছে ২.৪৯ লক্ষ টাকা।

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কোন পেনশন তহবিল গড়ে ওঠেনি

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত ৯ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিকের জন্য কোন পেনশন তহবিল গড়ে উঠল না। এনিয়ে এল আই সি-র সঙ্গে কথাবার্তা চালালেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়ে উঠল না। রাজ্য সরকারের এটা সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এদিকে, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত শ্রমিকদের নথিভুক্তি, চাঁদা বাবদ ১৭.৫৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল। **এর মধ্যে ১০.৯০ কোটি টাকা তহবিলে জমা পড়লেও ৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা রয়ে গেছে মূল তহবিলের বাইরে! কোথায় সে টাকা রয়েছে ক্যাগ রিপোর্ট তা উল্লেখ করেনি।**

রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের বোর্ডে নথিভুক্তির কাজটা মূলত ট্রেড ইউনিয়নগুলোই করত। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাধান্যকে রুখতে গ্রামে-গঞ্জে এজেন্ট নিয়োগ করে নথিভুক্তির কাজটিতে সরকারি প্রশ্রয় দেওয়া শুরু হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে ঐ সমস্ত এজেন্টরা এই কাজ করে থাকে। আর স্থানীয় স্তরে এদের সঙ্গে রয়েছে শ্রম দপ্তরের কিছু অসৎ ব্যক্তির যোগসাজশ। ঐ সমস্ত এজেন্টদের কাজগুলো শ্রম দপ্তরের কর্মীরা বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিকদের তহবিল নিয়ে যে ব্যাপক গরমিল, অনিয়ম বোর্ডের তরফ থেকে করা হয়েছে, কোটি কোটি টাকার সেস জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে চরম অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য, তার খেসারত আজ দিতে হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকদেরই। রাজ্য শ্রম দপ্তরের এই চরম শ্রমিক বিরোধী আচরণ ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তোলা দরকার।

- অতনু চক্রবর্তী

বাঁকুড়ায় প্রচার মিছিল

পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে গত ১৬ অক্টোবর সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখা ওন্দা ব্লকের নিকুঞ্জপুর অঞ্চলে কতকগুলো দাবিতে এক প্রচার মিছিল সংগঠিত করে। দাবিগুলো হল, জি এম বীজ চালু বন্ধ করা, ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের সার-বীজ সরবরাহ করা, কৃষিতে ১ টাকা ইউনিট দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষকদের থেকে লাভজনক দামে কৃষিপণ্য কিনতে হবে। মিছিল বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। শ্লোগান ওঠে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কৃষকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে। মিছিল স্থানীয় কৃষকদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মানুষজন এই উদ্যোগকে সমর্থন জানান। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জেলার কৃষক নেতা বৈদ্যনাথ চীনা, অজিত দাস, সি পি আই (এম এল) জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জী।

... উন্মাদের রাজনীতি প্রতিহত করুন

একের পাতার পর

'মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া'।" তহেলকা পত্রিকার ১৫ জানুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায় 'ইন দি ওয়ার্ডস্ অব এ জেলট্' (এক উন্মাদের জবানবন্দী) শিরোনামে এই জবানবন্দী ছেপে বের হয়। আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের '**দেশপ্রেম**' দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় হৈ-চৈ বেঁধে যায়, আর এস এস-এর **চাপের মুখে অসীমানন্দ পিছু হটে**, তারপর ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে "**দি ক্যারাভান**" আরও বিস্তৃত তথ্য সহ অসীমানন্দের এক গোপন সাক্ষাৎকার ছাপিয়ে দেয়, সঙ্গে অডিও টেপও প্রকাশ করে। দি ক্যারাভান-এ প্রকাশিত আরও বিপুল ও বিপদজনক তথ্যাবলী আর এস এস-এর রাজনৈতিক ছক ও ফ্যাসিস্ত পরিকল্পনা বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। সে সব কথায় যাওয়ার আগে আমাদের জানতে ইচ্ছে করে **সি বি আই এবং নিয়া মোহন ভাগবত এবং আর এস এস-বিজেপির অন্যান্য সন্দেহজনক ব্যক্তি বা আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কিনা**? গত ২ অক্টোবর বর্ধমানে খাগড়াগড় বোমা বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা নিয়া রাজ্যের এ-মাথা থেকে ও-মাথা, মাদ্রাসা থেকে মুসলিম জনবসতি, নিহতের শ্বশুর-শ্বাশুড়ি থেকে শ্যালক-ভগ্নীপতি, আত্মীয়-স্বজন থেকে পাড়া প্রতিবেশিকে যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ও গ্রেপ্তার করে চলেছে, সেই "নিখুঁত তদন্ত" করার জন্য আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের ভাই-ভাতিজাদের জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিল কি? জানার ঔৎসুক্য থেকেই গেল!

সে কথায় আমরা পরে আসব। বরং অসীমানন্দের জবানবন্দী অনুসরণ করা যাক। অসীমানন্দ জানাচ্ছে, হুগলী জেলার কোন এক কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর সে আর এস এস-এর সর্বসময়ের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করে। রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের এতে কোন দায় আছে কিনা, তা অসীমানন্দ জানায়নি। প্রথমে এ রাজ্যেরই আর এস এস-এর শাখা সংগঠন **বনবাসী কল্যাণ সমিতি-র** মাধ্যমে আদিবাসী-বনবাসী ও অন্যান্য দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করার পর বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও অন্যান্য অঞ্চলে 'ভাল কাজ করার সুবাদে' আর এস এস-এর নেতৃবৃন্দের নজরে আসে এবং তারপর **গুজরাটের ডাঙ্গ জেলায়** আর এস এস-এর প্রচারক হিসাবে **শাবরী ধাম আশ্রম** প্রতিষ্ঠা করে, যার মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় 'আদিবাসীদের হিন্দু ধর্মে রূপান্তরকরণ (কানভারশান টু হিন্দুইজম)। **বনবাসী কল্যাণ সমিতি ও শাবরী ধাম আশ্রমের** কর্মীরা এরপর একের পর এক আদিবাসী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন ও খ্রিষ্টীয় চার্চগুলোতে হামলা চালায়, যাতে **আতঙ্কগ্রস্ত খ্রিষ্টান আদিবাসীরা হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হয়**। এত 'ভাল কাজ' সেলিব্রেট করার জন্য **২০০৩ সালে কুম্ভমেলা** সংগঠিত করে, যেখানে আর এস এস সংঘচালকরা ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীরা অনেকেই হাজির হয়েছিল।

গল্পটা এত সহজ নয়। আদিবাসী মহল্লাগুলোতে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরকরণের পেছনে কাজ করেছে ঐ অঞ্চলের জল-জমি-জঙ্গলের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা এবং এ কাজে **তাদের অর্থ যোগান দিয়েছে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা**। পরে সেই জমি-জঙ্গল-জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কব্জা বসিয়েছে দেশি-বিদেশী কর্পোরেট সংস্থা। আর এস এস-এর প্রচারকদের সঙ্গে কর্পোরেট প্রতিনিধিদের এই '**সখ্যতা**' পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। নিজেদের জল-জমি-প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভিটে-মাটি রক্ষায় আদিবাসীরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, তাকেই কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া **নকশালপন্থী/মাওবাদী সন্ত্রাস** নামে প্রচার করেছে। বিজেপি নিয়ন্ত্রিত সমস্ত রাজ্যগুলোতে এই **লুঠের রাজনীতিকে** গ্রহণযোগ্যভাবে তুলে ধরার জন্য আমাদের কর্পোরেট মিডিয়াগুলো ২৪ ঘন্টা পরিশ্রম করছে। দেশের উন্নয়নের "**এক নম্বর শত্রু**" বলে প্রতিবাদকারীদের চিহ্নিত করেছে। আদিবাসী জনগণের ঐ সমস্ত প্রতিরোধগুলো 'উন্নয়ন-বিরোধী' 'দেশ-বিরোধী কাজ'। নরেন্দ্র মোদী-মোহন ভাগবতরা তাদের হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে "**সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম**" চালায় তার সাথে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর স্বার্থের অভিন্নতা আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিভিন্ন এলাকায় "**দাঙ্গা-সন্ত্রাস ও ধর্মান্তরকরণের**" পেছনে যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণগুলো রয়েছে তার বিস্তৃত অনুসন্ধান রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের তৎকালীন জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার ও মুম্বাই এ টি এস প্রধান **হেমন্ত কারকারে**। ২৬/১১-র 'সন্ত্রাসী হামলার' দিন সকালে হেমন্ত কারকারে লাগাতার **তাঁর প্রাণসংশয়ের** আশঙ্কা ব্যক্ত করে টেলিফোন করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনার পেছনে কি কি কারণ ছিল তার বিস্তৃত অনুসন্ধান না করেই তৎকালীন কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার "ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি" বিল লোকসভায় পেশ করে (২০০৮-এর ৩০ ডিসেম্বর) এবং **পার্লামেন্টে বিনা আলোচনায় পাশ হওয়ার পর ২০০৮-এর ৩১ ডিসেম্বর** তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল স্বাক্ষর দিয়ে নিয়া অ্যাক্টে সিলমোহর লাগিয়ে দেন। **সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে জাতীয় উন্মাদনা তৈরী করে গণতন্ত্র সংকুচিত করার আরও একটি কালা কানুন ও সংস্থা** কত তাড়াতাড়ি তৈরী হতে পারে, নিয়া অ্যাক্ট তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পাঠককে আরও একটু স্মরণ করিয়ে দিই ঐ একই দিনে ঐ একই অধিবেশনে পার্লামেন্টে ইউ এ পি এ (সংশোধনী) বিল পাশ হয়ে যায় বিনা বিতর্কে। '**দেশপ্রেমের**' এই কোরাসে দক্ষিণপন্থী, অতি দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী, বামপন্থী, বিজেপি, কংগ্রেস, সমাজবাদী, তৃণমূলী, বামফ্রন্টীয় কোন দলের কোন সাংসদের কোন প্রতিবাদই নজরে আসেনি (যেভাবে 'সেজ' আইন পাশ করা হয়েছিল)।

তবে কি এদেশে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসের কোন বিপদ নেই। নিশ্চয়ই আছে। যে কোন সন্ত্রাসবাদই নিন্দনীয়। তাকে প্রতিহত করা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের বলি হয় নিরীহ সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসের রাজনীতি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রেণী আন্দোলনকে বিপথগামী করে, জনগণের মধ্যে বিভাজন ঘটায়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি করে। তাই একে প্রতিরোধ করার জন্য জনগণের ঐক্য সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। এর বিরুদ্ধে জোরালো জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কিন্তু 'বাজার-মৌলবাদে' বিশ্বাসী আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলো এই বিভাজন তৈরির কাজে নেমে পড়ে। বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ও তার পর নিয়া, এন এস জি-র তদন্ত-গ্রেপ্তারির সংবাদ যে '**নিপুণ বর্ণনায়**' প্রচার করা হচ্ছে, তা এই সম্প্রদায়গত বিভাজনকেই আরও জোরালো করছে। 'খবর বিক্রির' প্রতিযোগিতায় 'উচ্চ-মেধার আতুঁড়ঘর' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলছে অন্যান্য ছাপা ও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমগুলোর। দেখে-শুনে মনে হয়, ঐ সংবাদ মাধ্যমগুলোতে নিয়া এবং এন এস জি-র লোকজন কাজ করে, নতুবা ঐ তদন্ত সংস্থাগুলোতে সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিরা রয়েছে। '**এমবেডেড জার্নালিজম**'-র এর থেকে ভাল উদাহরণ আর কি হতে পারে?

রাজনীতির কথায় আসার আগে বিজেপি আর এস এস-এর 'দেশপ্রেম' নিয়ে দু-চার কথা বলা যাক। '৪২-এর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে (এ আই সি সি-র বোম্বাই অধিবেশন, ৮ আগস্ট গৃহীত সিদ্ধান্ত) গোটা দেশ ও দেশের জনগণ যখন উত্তাল আন্দোলনে নেমে পড়েছে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ-বিরোধী গণআন্দোলনে '৪২-র ভারত ছাড়ো আন্দোলনই তীব্রতায় ও গণঅংশগ্রহণে সর্ববৃহৎ, তখন গান্ধী পর্যন্ত শ্লোগান তুলেছেন "ডু অর ডাই" (করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে), "লিভ ইণ্ডিয়া টু গড অর টু এনার্কি (ঈশ্বর বা নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে ব্রিটিশ তুমি চলে যাও), তখন আর এস এস-এর সরসংঘচালক গুরু **গোলওয়ালকর কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন "আগস্ট বিপ্লবে" অংশগ্রহণ না করার জন্য**। ১৯৪২-এর ৪ সেপ্টেম্বর হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকর নির্দেশ দিচ্ছেন, "স্থানীয় প্রশাসন, বিধানসভা বা সরকারি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করা চলবে না। তাদের প্রত্যেককে নিয়মিত সরকার নির্দেশিত কাজকর্ম করে যেতে হবে"। আর এক বাঘা হিন্দু মহাসভা নেতা পরবর্তীতে জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তখন বাংলার ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সরকারের মন্ত্রী। যখন মেদিনীপুরে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মেদিনীপুর জুড়ে ব্রিটিশ সন্ত্রাস চলছে, তখন 'দেশপ্রেমিক' শ্যামাপ্রসাদ বাংলার মন্ত্রী!!

গান্ধী হত্যার পর গঠিত **কাপুর কমিশন**ও জানাচ্ছে, **হিন্দুত্বের নামে** যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ও হিংসার বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে গান্ধী হত্যা সংগঠিত করেছে নাথুরাম গডসে ও তার সঙ্গী সাথীরা। এই নাথুরাম গডসে-ই বিজেপি-আর এস এস-এর ছাত্র সংগঠন এ বি ভি পি-র আদর্শ। এ বি ভি পি-র সম্মেলন শুরুর আগে গডসে-র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে। '৯২-৯৩-এ বোম্বাই দাঙ্গার পর গঠিত শ্রীকৃষ্ণ কমিশনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' সংগঠনগুলো লোকবল, অর্থবল, পেশিবলে ও নেটওয়ার্কে যে মাত্রায় সংগঠিত ও শক্তিশালী, 'কোন সংখ্যালঘু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন-ই তার ধারে-কাছে যেতে পারবে না। এই বিজেপি-আর এস এস-ই এখন দেশবাসীকে ওদের থেকে 'দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট' নিতে বলছে। '৪৭-এ দেশভাগকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী দাঙ্গার দিনগুলোতে উত্তরপ্রদেশের আজমগড় সহ পূর্ব উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিয়েছে আর এস এস সরসংঘচালক গুরু গোলওয়ালকর। তৎকালীন আজমগড়ের জেলা শাসক রাজেশ্বর দয়াল গোলওয়ালকরকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ওকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দেন (**এ লাইফ অব আওয়ার টাইম, রাজেশ্বর দয়াল,** আই সি এস দ্রষ্টব্য)। ১৯২৬ থেকে ২০১৪ আর এস এস এবং সংঘ পরিবারের সন্ত্রাস ও দাঙ্গার রাজনীতির পেছনে কাজ করে ওদের হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও কর্পোরেট পুঁজির দাসত্ব ও সেবা করার মতাদর্শ। ভিন্ন সময়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

আমরা বরং প্রাসঙ্গিক এক রাজনৈতিক বিষয়ে ফিরে আসি। খাগড়াগড় বোমা বিস্ফোরণের পর রাজ্যজুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করার কাজে নেমে পড়েছে আর এস এস-বিজেপি ও তাদের প্রসাদভোগী সংবাদ মাধ্যমগুলো। এই প্রচারে গা ভাসিয়েছেন সি পি এম সহ বামফ্রন্টের শরিকদলগুলো। খাগড়াগড়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়া হোক এতে কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয়। যে সমস্ত ব্যক্তি-রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা পুলিশ কর্তাদের এতে কোন যোগসাজশ থাকবে তাদেরও উপযুক্ত শাস্তি হোক। কিন্তু তদন্ত শেষ করার আগেই একটি সম্প্রদায়কে অপরাধী প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে মাদ্রাসাগুলোকে 'সন্ত্রাসের আতুঁড়ঘর' বলে প্রমাণ করার। একদিকে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করা, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আতঙ্কগ্রস্ত করার অভিযান চলছে। ইসলামো ফোবিয়া তৈরীর এক অপচেষ্টা চলছে। সতর্ক হতে হবে। বাংলাকে গুজরাট বানিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের ভোট সংগ্রহের অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। হিন্দু ভোটের পাশাপাশি আতঙ্কগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনও যাতে জীবনের নিরাপত্তার জন্য বিজেপিকে রাজ্যে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য ভোট দেয়, তার পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসা নিয়ে দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক। মাদ্রাসা শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ দারস থেকে। যার অর্থ জ্ঞান আহরণ (ইলম)ও পাঠদান (ফরজ বা আবশ্যিক করা)। একদম শিশু বয়সে **মক্তবে** শিক্ষালাভের পর মাদ্রাসায় পড়াশোনা হয়। সারা বিশ্বে লক্ষাধিক মাদ্রাসা আছে। আমাদের রাজ্যে এই সংখ্যা আনুমানিক ১৬,০০০। এর মধ্যে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্তের ৬০০-৬৫০ মতো। অনুমোদন প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলো **হাই মাদ্রাসা** (দশমশ্রেণী পর্যন্ত) এবং **সিনিয়র মাদ্রাসা** (দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত)। একের পরিচালনা ও পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা। এরা আলিম (মাধ্যমিক), ফাজিল (উচ্চ মাধ্যমিক) সার্টিফিকেট দেয়। কামিল (স্নাতক) ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা পরিচালনা করে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা, ইংরাজী, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের পাশাপাশি হাই মাদ্রাসায় কোরান, হাদিস্, ফিক্হ্ সহ ইসলামী ধর্মতত্ত্ব পড়াশোনা হয়। ভারতের সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই অধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলোকে বলা হয় **খারিজি মাদ্রাসা** (যা বেসরকারী উদ্যোগে এবং সাধারণ মানুষের জাকাত ও ফেতরার সাহায্য ও দানে চলে) এবং কোরানিয়া বা ফোরকানিয়া (কোরানের আর এক নাম ফোরকান) মাদ্রাসা, যা মসজিদ সংলগ্ন। মূলতঃ কোরান ও ধর্মতত্ত্ব এখানে পড়ানো হয়। কোরান সম্পূর্ণ মুখস্ত করতে পারলে হাফেজ উপাধি দেওয়া হয়। ধর্মতত্ত্ব শেখার এই সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে দারিদ্র্য পীড়িত, দুঃস্থ সংখ্যালঘু পরিবারের ছেলেরা যদি একটু লেখাপড়া করে, লেখাপড়ার একত্রিত হয়, বন্ধুত্ব হয়, তাহলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় কে জানে।

৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসন ও প্রায় সাড়ে তিন বছরের তৃণমূলী শাসনের পর সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষার কত উন্নতি হয়েছে, 'স্ন্যাপের' সর্বশেষ সমীক্ষায় (প্রতীচীর সহযোগিতায়) তা ধরা পড়েছে। ২০১১-র নির্বাচনী ইস্তেহারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১০,০০০ মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়া হবে। তার কি হল? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বাসস্থান, কর্মসংস্থানে উন্নতি ৬৭ বছরের স্বাধীন দেশে কতটা হয়েছে, তা এখন চোখের সামনে। অথচ সবাই নাকি 'মুসলিম তোষণ করছে'—বিজেপি তো গলা ফাটিয়ে এই প্রচার চালায়। এবার এই মাদ্রাসাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। এখানে নাকি বিদেশী টাকা আসে, সন্ত্রাসবাদীরা জন্ম নেয় এই অভিযোগ তুলে আক্রমণ শানাচ্ছে বিজেপি-আর এস এস। কেউ একবার প্রশ্ন করে না, আর এস এস পরিচালিত স্কুলগুলোতে কি শিক্ষা দেওয়া হয়। কৃষিজীবী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে "অপর বানাও", তাদের জমি-জিয়েত, সম্পত্তি লুঠ কর, তাদের আতঙ্কগ্রস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত কর—হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর সেই স্বপ্ন তাহলে পূরণ হবে। অনুপ্রবেশকারী বলে এদের তাড়িয়ে দেওয়া যাবে, নতুবা সন্ত্রাসবাদী বলে জেলে পোরা যাবে। বিজেপি-আর এস এস-এর উন্মাদ ও উৎপাতের রাজনীতিকে হাওয়া দিচ্ছে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। সতর্ক হোন, সোচ্চার হোন, এই ফ্যাসিস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করুন—এটাই সময়ের দাবি।

- **পার্থ ঘোষ**

ফিরে দেখা ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে হিন্দুত্ববাদীদের স্বরূপ

‘বীর’ সাভারকর, সঙ্ঘ পরিবার ঃ কিছু তথ্য, কিছু কথা

(মোদী সরকার কেন্দ্রের মসনদে বসার পর থেকে সঙ্ঘী পূর্বসূরীদের ‘জাতির গৌরব’ বলে খুব তুলে ধরার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে নতুন করে। পক্ষান্তরে, বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ঐ সমস্ত সঙ্ঘী পুরোধাদের প্রকৃত ইতিহাস কি ছিল তার ছবি আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব। —সম্পাদকমণ্ডলী)

২০০০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আন্দামান বিমান বন্দরের নতুন নামকরণ করা হয়েছিল ‘বীর’ সাভারকরের নামে। এ ব্যাপারে কোনোরকম বিতর্ককে কেন্দ্রের তৎকালীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার আমল দেয়নি। বরং কেন্দ্রীয় সরকার যে সচেতন এবং পরিকল্পিত পথেই এই নতুন নামকরণে অগ্রসর হয়েছিল, তা পরের বছর (২০০১) ফেব্রুয়ারির শেষে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারপর তারা খোদ সংসদ ভবনেই সাভারকরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেণ্ডামাফিক হিন্দুত্ববাদের পতাকা উড়িয়েছিল। কোনোরকম বিরোধিতা বা বিরোধী মতকে তাঁরা আমল দেননি। সঙ্ঘ পরিবারিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে এটাই।

সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে মহা-উদগ্রীব এই ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ববাদীরা ইতিহাসকেও নিজেদের পরিকল্পিত ছকের অনুবর্তী করতে চেয়েছে বারবার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দিককার দশ বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়কালীন ইতিহাস নিয়েও তারা অনেক কুৎসা করেছিলেন, প্রতিথযশা ঐতিহাসিকদের (তাঁরা সঙ্ঘ আদর্শের অনুবর্তী না হওয়ায়) সম্পর্কে মিথ্যা, অশালীন ও অবমাননাকর মন্তব্য করতেও পিছপা হননি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মারাঠি সাংবাদিক ভি ভি তাহমাঙ্কর ছিলেন ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির গুণমুগ্ধ ভক্ত। তিনি মুসোলিনির একটি জীবনীও লিখেছিলেন। তিনি মনে করতেন আর এস এস-এর লক্ষ্যই হওয়া উচিত ফ্যাসিস্ত ভারত গঠন। এই তাহমাঙ্করের চিন্তাভাবনার ভেতর নিজের মনোভঙ্গীর মিল খুঁজে পেয়েছিলেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা এবং হেডগেওয়াড়ের পরামর্শদাতা বি এম মুঞ্জে। তাঁর ইতালি ভ্রমণের দিনলিপিতে লিখেছিলেন যে একমাত্র ফ্যাসিস্ত মতাদর্শই হিন্দুত্ববাদী ভারত নির্মাণে উপযোগী। তিনি হেডগেওয়াড়ের আর এস এস-এর প্রচার, প্রসার ও ব্যাপক বিস্তৃতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই দিনলিপি মুঞ্জে লেখেন ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। এর তিন বছর পর ১৯৩৪-এর ৩১ জানুয়ারি নাগপুরে ‘ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনি’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় হেডগেওয়ার এবং মুঞ্জে ভারতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এসব ঘটনার এগারো বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল সাভারকারের ‘হিন্দুত্ব’ শীর্ষক বইটি। সেই বইতে তিনি সরাসরি মন্তব্য করেছিলেন যে মুসলমানরা এদেশে আসলে বিদেশি কেননা তাদের প্রকৃত আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, মক্কার প্রতি। স্বভাবতই কেবলমাত্র হিন্দুভারত নির্মাণের সময় শত্রু মিত্র চিহ্নিত করার কাজটি অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে এই সাভারকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই নাৎসি জার্মানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ নাৎসি জার্মানি এই বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলে তাদের প্রতীক ‘স্বস্তিকা’র সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেশের হিন্দুত্ববাদীরা জার্মানির মতো একটি ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র গঠন করতে চান কেননা এরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারতের হিন্দুরা তাঁদের অতীত গৌরব ফিরে পেতে পারেন।

প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের সাফল্যের ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতার মসনদ দখল করেছন ‘বিকাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র মোদী। মানুষকে ‘সুদিনে’র স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এখন তাদের নিজেদেরই স্বপ্নের সুদিনের স্বার্থেই দেশের মানুষকে দুর্দিনের অন্ধকারে নিমজ্জিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে পুনের প্রকাশ্য রাস্তায় মোদীর অতিপ্রিয় হিন্দু রাষ্ট্রসেনার সেনাপতিরা হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে এবং পাথর ছুঁড়ে খুন করেছে মহসিন সাদিক নামের এক নিরপরাধ মুসলিম যুবককে। এভাবে তাকে খুন করার পর খুনিরা মোবাইলে মেসেজে লিখেছে ঃ প্রথম উইকেটের পতন হয়েছে। সাদিককে খুন করার আগে তারা শিবাজী ও বাল থ্যাকারের ছবি নিয়ে কয়েকদিন ধরে দাঙ্গা করেছে। সম্প্রতি মোরাদাবাদে সংঘটিত হয়েছে মোদী বান্ধবদের তাণ্ডব। এসব ব্যাপারে সুদিনের কারবারি মোদী নীরব। কুখ্যাত দাঙ্গাবাজ ও খুনি অমিত শাহ এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবচাইতে কাজের ও নির্ভরযোগ্য সহযোগী। ২০০২-এর সংঘটিত গণহত্যার সময় মোদীর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়েই অসংখ্য সংখ্যালঘু নরনারীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল। সঙ্ঘ পরিবারের তরফে সংঘটিত সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞে মোদীর দ্বিধাহীন অনুমোদন তো বহুচর্চিত বিষয়। রক্তপাত, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং পুড়িয়ে মারার হিন্দুত্ববাদীদের কোনো কাজে পুলিশ বা প্রশাসন কোনোরকম বাধা দেয়নি। গুলবার্গ সোসাইটির গণহত্যায় প্রাক্তন কংগ্রেস এম পি এহসান জাফরি সহ সত্তর জন আক্রান্ত হন এবং নানাবিধ অত্যাচারের পর এদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। অথচ এহেন গণহত্যায় মোদীর হাত থাকা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আদেশে গঠিত ‘সিট’ তদন্তসাপেক্ষে মোদীকে ‘ক্লিন চিট’ দেয়। এই মোদী হচ্ছেন এখন সুদিনের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রণালীতে হিন্দুত্ববাদীরা ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠছে। পাকিস্তানবিরোধী প্ররোচনা সৃষ্টি করছে, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নানারকম ভীতি প্রদর্শন করছে, সন্ত্রাসবাদ আর মুসলিম জনসাধারণকে সমার্থক করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে চাইছে। ‘লভ জিহাদ’-এর নামেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। দেশের নাম ইণ্ডিয়া বা ভারতের বদলে হিন্দুস্তান করার পক্ষে কুশলী সওয়াল করছে। পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানী অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় ‘হিন্দুদের ত্রাতা’ হিসেবে কারা ছিলেন, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের সম্মানদানের প্রসঙ্গটি সামনে এনে পুরানো দাঙ্গার স্মৃতি জাগিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে লালন করতে চাইছে।

গান্ধীজী গোলওয়ালকরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর স্বীকার করেছিলেন যে তিনি তাঁকে (গোলওয়ালকরকে) ‘বিশ্বাস করতে পারেন নি; গোলওয়ালকরের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতকারের পরও গান্ধীজী বলেছিলেন যে গোলওয়ালকরদের ‘কথায় আদৌ বিশ্বাস করা যায় না’। প্যাটেলের মতো নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে চিঠিতে সরাসরি বলেছিলেন যে আর এস এস-এর কাজকর্মের জন্যই গান্ধী-হত্যা সংঘটিত হয়েছে। নাথুরাম আর এস এস-এর সদস্য হিসেবেই যে গান্ধী-হত্যা করেছিলেন তা পরবর্তীকালে নাথুরামের ভাই গোপাল গড্‌সে স্বীকার করেছিলেন। অথচ এই গান্ধী-হত্যাকারীরা আজ গান্ধী প্রেমে গান্ধীবাদীদের লজ্জা দিচ্ছে----এটাই হচ্ছে সঙ্ঘ পরিবারিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

নাথুরাম ছিল সাভারকারের শিষ্য। নাথুরাম আদালতে বলেছিল যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সংগঠকরা সাভারকরের দিকেই তাকিয়ে আছেন, কেননা সাভারকার তাঁদের নেতা এবং হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় সবচাইতে বিশ্বস্ত। হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় সবচাইতে বিশ্বস্ত এই সাভারকারের নামে তাই হিন্দুত্ববাদীরা আন্দামান বিমান বন্দরের নতুন নামকরণ করে, খোদ সংসদ ভবনে তার মূর্তি বসায়। কে এই সাভারকার?

উৎসের দিকে

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কজনক ঘটনার বাহুল্যের নিদর্শনাবলী একদিকে যেমন বেদনাবহ বার্তাসঞ্চারক, তেমনি বিপরীত দিক দিয়ে এইসব কলঙ্গজনক ঘটনাবলী আবার কারও কারও কাছে প্রেরণার উৎসভূমি হিসেবে কাজ করে থাকে। একজন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, তাত্ত্বিক ও শিক্ষক একবার এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে স্মরণ দুভাবে হতে পারে। প্রথমত শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং দ্বিতীয়ত ঘৃণার সঙ্গে। ট্রটস্কিকে কমিউনিস্টরা স্মরণ করবেন ঘৃণার সঙ্গে। অনুরূপভাবে ইতিহাসের কলঙ্কজনক ঘটনার নিদর্শনগুলো একদিকে যেমন ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করে তার পুনরাবৃত্তিরোধে শপথ গ্রহণের অঙ্গীকার ঘোষিত হয় বিবেকবান মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় যে মানবতাবোধের নিষ্পেষক, ধর্ষকরা বারবার এইসব কলঙ্কজনক ঘটনাকে প্রেরণার আশ্রয়স্থল বিবেচনা করে সেই কলঙ্কজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে তাদের দর্শনের সার্থকতা খুঁজে পায়। এই শেষোক্ত দর্শনটি হলো মানবতাবাদবিরোধী সভ্যতার পরিপন্থী। ফ্যাসিবাদের দার্শনিক ভিত্তিতে এর সন্ধান মেলে।

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত করার পর এবং দেশজুড়ে রক্তক্ষয়ী বীভৎস দাঙ্গা সংঘটিত করার পর যখন সারাদেশ জুড়ে মানবতাবাদী বিবেকের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল, তখনও এই কলঙ্কজনক ঘটনার সংঘটকরা এতটুকু লজ্জাবোধে অবনত হয়নি, বরং তারা ফ্যাসিস্ত দর্শনের অবস্থান থেকে এই বীভৎস মানবতাবিরোধী ক্রিয়াকলাপকে ন্যায্যতাদানে অক্লান্ত থেকেছিল। অসংখ্য মুসলিম-হত্যার রক্তরঞ্জনে তারা হিন্দুত্বের জাগরণের সন্ধান পেয়ে উদ্দাম নৃত্যে সামিল হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দেশ শাসনের ভার হাতে তুলে নিয়েছেন!

বিরানব্বইয়ের ঠিক দশবছরের মাথায় তারা আবার আর একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করলো গুজরাটে। প্রকৃতপক্ষে বিরানব্বইয়ের ডিসেম্বর যে পরিকল্পনার সূচক হিসেবে কাজ করেছিল, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমার্ধে গুজরাটের ঘটনা তার যথার্থ অঙ্গ হিসেবেই সংঘটিত হয়েছে। গোধরা-কাণ্ড যেভাবে প্রচার-প্রচারণা রেখে ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ববাদীরা গুজরাটে জাতিহত্যার সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসী স্বাক্ষর রেখেছে, তা তাদের রাজনৈতিক দর্শনের নিহিতার্থকেই তাৎপর্যায়িত করেছে মাত্র। গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসে ‘হিন্দু’ করসেবকদের একটি বড়সড় দলকে (৫০/৬০ জনের) জীবন্ত দগ্ধ করে পুড়িয়ে মেরেছে অহিন্দু মুসলমানরা, এরকম একটা নিছক অভিযোগ প্রচারে রেখেই শুরু হয়েছিল মুসলিম নিধনের বীভৎস ঘটনাবলী। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দাঙ্গাকারীদের পক্ষে কায়েম হয়েছিল। বাড়িঘর পোড়ানো, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা সহ অজস্র মুসলিম নরনারীদের খুন করা হয়েছে হিন্দুত্বের জাগরণের নামে। নাৎসি-নায়ক ফ্যাসিস্ত হিটলারের প্রচারসচিব গোয়েবলস একসময় বলেছিলেন ঃ আপনি যদি বিরাট মিথ্যা বলেন, লাগাতার বলে যান, সেটা তখন সত্য হয়ে উঠবে। একটা মিথ্যাকে বারবার জোরের সঙ্গে প্রচারের মাধ্যমে তাকে সত্যি বলে জাহির করার প্রবণতা তো ফ্যাসিজমেরই শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত সঙ্ঘ পরিবার ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে চাইছে এদেশের মুসলমান-খ্রিষ্টান সহ অহিন্দুদের নিধনের মাধ্যমে। আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)-এর তথা সঙ্ঘ পরিবারের গুরু গোলওয়ালকর তো কোনরকম রাখঢাক না-রেখেই জার্মানির ফ্যাসিবাদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন এবং ফ্যাসিস্ত হিটলারের ইহুদি নিধন থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশে মুসলিম নিধনের তত্ত্বায়ন করেছিলেন। গোলওয়ালকর বলেছিলেন ঃ ‘‘জার্মান জাতিগর্ব আজ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাদের জাতি ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সেমিটিক জাতিগুলোকে অর্থাৎ ইহুদিদের তাড়িয়ে দিয়ে জার্মানরা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছে। জাতিগর্বের এটাই সর্বোচ্চ প্রকাশ। জার্মানী এটাও প্রমাণ করেছে যে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতিকে—যাদের মধ্যকার ফারাক একেবারেই মৌলিক—মিলিয়ে এক অখণ্ড সমগ্র গড়ে তোলা সত্যিই অসম্ভব। এই শিক্ষা হিন্দুস্তানে আমাদের পক্ষেও খুবই লাভজনক।’’

স্বভাবতই বিরানব্বইয়ের কলঙ্কজনক ঘটনা সংঘটিত করার ঠিক দশ বছরের মাথায় গুজরাটের জাতিহত্যার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা সংঘটন এই ফ্যাসিস্ত শিক্ষার ফলশ্রুতি। এইসব মানসভ্যতার হন্তারক, নিকৃষ্ট মননের ঘাতকরা ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলো থেকে প্রেরণার উৎস সন্ধান করে এবং আরও কলঙ্কজনক ঘটনা সংঘটনের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তির স্বাদ আস্বাদন করে থাকে।

উৎস থেকে ফিরে

গুজরাটের ঘটনার অনির্বাপিত আগুনের উত্তাপঘন অবস্থানে দাঁড়িয়ে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানি ঘোষণা করেছিলেন যে আন্দামান বিমান বন্দরের নামকরণ করা হবে বীর সাভারকারের নামে। এবং সেই মতো মে ৪, ২০০২ তারিখে আন্দামান বিমান বন্দরের নতুন নামকরণ হয় বীর সাভারকারের নামে।

সাভারকারের নামে এই নামকরণও হিন্দুত্বের জাগরণের চিন্তাচেতনার সঙ্গেই নিবিড় সম্পর্কেই আবদ্ধ। এই নব-নামকরণের অনুষ্ঠানে আবেগবিহ্বলতার সঙ্গেই আদবানি বলেছেন ঃ বীর সাভারকার যার বড়মাপে অবতারণা করেছেন, সেই প্রবহমান হিন্দুত্ব নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই ...। এটা একটা সার্বিক প্রবহমান মতাদর্শ, যার উৎস রয়েছে দেশের ঐতিহ্যে।

হিন্দুত্বের বিষয়ে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণই নেই, আদবানি বলেই দিয়েছেন। স্বভাবতই গুজরাটে মুসলিম নিধনের ঘটনা যেহেতু হিন্দুত্বের জাগরণের অঙ্গীভূত বিষয়, সুতরাং এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। কি দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য। অথচ এই ঔদ্ধত্যের প্রচারক আমাদের দেশ শাসনের ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যে সাভারকারের নামে তিনি আন্দামান বিমান বন্দরের নব-নামকরণ করলেন, সেই সাভারকার ছিলেন বর্তমান সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম রাজনৈতিক গুরু ও হিন্দুত্ববাদের তাত্ত্বিক নেতা। সুতরাং গুজরাটে মুসলিম নিধনকরণের প্রক্রিয়া চালু রাখার পাশাপাশি সাভারকারের নামে আন্দামান বিমান বন্দরের নব-নামকরণের বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যবাহক।

আদবানির যুক্তি ছিল ঃ সাভারকার যথাযথ স্বীকৃতি পাননি। সুতরাং তাঁর যথাযথ তথা যথার্থ স্বীকৃতির দায় আদবানি নিজেই তুলে নিলেন। তাঁর বক্তব্য ঃ আন্দামানের সেলুলার জেলে দশ বছর অতিবাহিত করে ছিলেন সাভারকর। স্বভাবতই এই বিমান বন্দরের নাম সাভারকারের নাম হলে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়! তিনি আরও বলেছেন ঃ কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আছে যারা তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শের জায়গা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেখে থাকে। তাঁর উদ্দিষ্ট এই রাজনৈতিক দল হলো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনগুলো। তিনি এই ধরণের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মহানুভবতার পরিচয় রেখেছেন।

আটের পাতায় দেখুন

 Regd. No. 53207/94 P.R. No. KOL RMS /105/2013-2015

ভোজপুরের কুরমুরিতে গণধর্ষণ ও সামন্ততান্ত্রিক হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—আন্দোলন

গত ৮ অক্টোবর ডুমারিয়া গ্রামের মহাদলিত সম্প্রদায়ের চারজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ও দু-জন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ভোজপুরের কুরমুরি গ্রামের স্ক্র্যাপ বা ছাঁট-মালের এক কারবারির ব্যবসাস্থলে যায়। এরা সবাই ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে বেড়ায়। ছাঁট-মালের ঐ কারবারি নীলনিধি সিং বন্দুকের ডগায় ওদের আটকে রাখে এবং আরও দুই শাগরেদের সাথে ওদের ওপর গণধর্ষণ চালায়। প্রসঙ্গত, এই নীলনিধি সিং যে আগে রণবীর সেনার এক আঞ্চলিক কম্যাণ্ডার ছিল সে কথা সবাই জানে। লাগাতার ও জঙ্গী প্রতিবাদ আন্দোলনের পরই কেবল স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করতে ও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। সি পি আই (এম এল)-এর তথ্যানুসন্ধানি দল ১১ অক্টোবর ডুমারিয়া গ্রাম ও আরা শহর পরিদর্শনে যায়। ঐ দলে ছিলেন এ আই পি ডব্লিউ-এর সম্পাদিকা মীনা তেওয়ারি, বিহার আর ওয়াই এ-র প্রেসিডেন্ট রাজু যাদব, আরার প্রাক্তন সাংসদ রামেশ্বর প্রসাদ, এ আই পি ডব্লিউ এ-র রাজ্য সভাপতি সরোজ চৌবে এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁরা গণধর্ষণের শিকার মহিলা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তথ্যানুসন্ধানি দল জানতে পারে, মূল অভিযুক্ত নীলনিধি সিং আরার বিজেপি সাংসদ আর কে সিং এবং তারারির জে ডি ইউ বিধায়ক সুনীল পাণ্ডের মদতপুষ্ট। আর এই কারণেই তারারির পুলিশ কর্মীরা এবং আরার জেলা প্রশাসন তার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যবস্থা নিতে চায়নি। তবে সি পি আই (এম এল)-এর উদ্যোগে এবং জনগণের চাপ বাড়ার পর তারা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। ঘটনা ৮ অক্টোবর ঘটলেও সরকারিভাবে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় ২৪ ঘন্টা পর এবং ঐ মহিলাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় ১০ অক্টোবর। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণকে বিলোপের এবং সাক্ষীদের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এই কারণে সি পি আই (এম এল) আরার এস পি এবং জেলা শাসকের সাসপেনশন ও তারারি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের অপসারণের দাবি জানিয়েছে। তিন অভিযুক্তকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনা দেখিয়ে দিল যে, কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের পর এবং বিহারে জে ডি (ইউ) সরকারের মদতপুষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ও রণবীর সেনার লোকজনরা কতটা অবাধে ও বেপরোয়াভাবে তাদের অপরাধ চালিয়ে যেতে পারছে। যে আমির দাস কমিশন রণবীর সেনার রাজনৈতিক সংযোগকে (বেশিরভাগটাই বিজেপি ও জে ডি (ইউ)-র সঙ্গে) উন্মোচিত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তাকে নীতীশ কুমার সরকারের তুলে দেওয়াটা এবং গণহত্যায় অভিযুক্ত রণবীর সেনার সদস্যদের আদালতের অব্যাহতি দেওয়াটা ঐ সমস্ত শক্তিগুলোর স্পর্ধাকে বাড়িয়ে তুলেছে। সম্প্রতি গয়ায় মহাদলিতদের জমি থেকে উৎখাত এবং গত বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন বাড্ডিতে দলিতদের উপর আক্রমণ একটা সতর্কতা সংকেত দিয়েছিল। আর কুরমুরির ঘটনা দেখিয়ে দিল, আদালতের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া রণবীর সেনার লোকজন মনে করতে শুরু করেছে যে, দলিতদের ধর্ষণ ও তাদের উপর অত্যাচার করে তারা পার পেয়ে যেতে পারে। তার সংঘটিত আগের অপরাধগুলোর জন্য নীলনিধি সিংকে যদি শাস্তি দেওয়া হত তাহলে এবারের এই জঘন্য অপরাধ ঘটাতে সে সম্ভবত সাহস করত না। অতএব সময় দাবি জানাচ্ছে আমির দাস কমিশনকে পুনর্বহাল করে তার রিপোর্টকে অবিলম্বে প্রকাশ করতে কেন্দ্রীয় ও বিহার সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

সি পি আই (এম এল) বিহারে রাজ্যব্যাপী জোরদার আন্দোলন শুরু করে দাবি জানিয়েছে—কুরমুরির গণধর্ষিতাদের ন্যায় বিচার দিতে হবে, তারারি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে অপসারিত করতে হবে, সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক এবং এস পি-দের সাসপেণ্ড করতে হবে ও আমির দাস কমিশনকে অবিলম্বে পুনর্বহাল করতে হবে।

এই গণধর্ষণের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) ১৩ অক্টোবর ভোজপুর বন্ধ ও রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদের ডাক দেয়। সেদিন ২০০ এ আই এস এ, আর ওয়াই এ কর্মী আরা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করে। আরা শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বন্ধ থাকে। বিহার আর ওয়াই এ নেতৃবৃন্দ আরা রেল স্টেশনে 'রেল চাক্কা জ্যাম' সংগঠিত করেন। ঐ জ্যাম কয়েক ঘন্টা জারি থাকে এবং পাটনা-মুঘলসরাই পথে রেল চলাচল বিঘ্নিত হয়। সি পি আই (এম এল) কর্মীরাও আরা বাস স্টপের কাছে ৩০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। সি পি আই (এম এল) কর্মীরা চারপোখরি, পিরো, সন্দেশ এবং আরার অন্যান্য স্থানে বিশাল-বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেন। প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য জগদীশপুরে সি পি আই (এম এল) কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পাটনা শহর, গ্রামীণ পাটনার বিভিন্ন অঞ্চল সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও কুরমুরির গণধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। জাহানাবাদে বিক্ষোভকারীরা কয়েক ঘন্টা ধরে জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করে রাখেন। আরওয়ালে ৫০০ বিক্ষোভকারী মিছিল করে শহরের রাস্তাগুলো পরিক্রমা করেন এবং আরওয়াল ব্লক অফিস চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। সিওয়ান, রোহতাস, মুজাফফরপুর, ভাগলপুর, বক্সার জেলার বিভিন্ন স্থানেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ভোজপুরে ন্যায় বিচারের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে সি পি আই (এম এল) এবং এ আই পি ডব্লিউ এ কর্মীরা দিল্লী, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও প্রতিবাদ সংগঠিত করেন।

অবাধ গণতন্ত্রের দাবিতে হংকং-এ প্রতিবাদী আন্দোলন

২০১৭-এর হংকং-এর প্রধান কার্যনির্বাহী নির্বাচন অবাধ হবে না নিয়ন্ত্রিত? জনগণের ভোটই সরাসরি তাদের প্রশাসককে ঠিক করবে না সেখানে নানারকম হস্তক্ষেপ থাকবে চীনা কর্তৃপক্ষের? এই সমস্ত প্রশ্নকে সামনে রেখেই আন্দোলন চলছে 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা'র মধ্যে থাকা হংকং-এ। চীনের সাথে ব্রিটেনের এক চুক্তির মধ্য দিয়ে ১৯৯৭ সালে হংকং ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে চীনের মধ্যে আসে। বিশ্বপুঁজির অন্যতম কেন্দ্র এই দ্বীপ শহরটি সাম্প্রতিক অতীতে চোখ ধাঁধানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই আলোচিত হত, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে তা উঠে আসছে অবরোধ অবস্থান আন্দোলনের সূত্র ধরে।

২০১৭ সালে হংকং-এর পরবর্তী প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত হওয়ার কথা। প্রথম ধাপে প্রার্থীদের মনোনয়ন কমিটির মাধ্যমে বাছাইয়ের পর তাদের মধ্য থেকে ভোটের মাধ্যমে কাউকে প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করতে চায় বেইজিং। এ পরিকল্পনা বাতিল করে সরাসরি নির্বাচনের দাবি করছে হংকং-এ শুরু হয় 'অকুপাই সেন্ট্রাল মুভমেন্ট', যাকে কেউ কেউ 'আমব্রেলা মুভমেন্ট' বলেও ডাকছেন। চীন এ দাবি না মানায় হংকং-এ বিক্ষোভের সূত্রপাত। চীনের আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হংকং-এ পরিপূর্ণ গণতন্ত্র দিতে বেইজিং অসম্মতি জানানোর প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত থেকে আন্দোলন শুরু করে হংকং-এর শিক্ষার্থীরা, যাদের সামনের সারিতে ছিলেন সতেরো বছরের তরুণ ছাত্র যশুয়া ওয়াং। পরদিন ২৭ সেপ্টেম্বর সকালেই বিরাট পুলিশ বাহিনী জমায়েতকে ঘিরে ফেলে। বিক্ষোভকারীদের সরকারি দপ্তরের এলাকা ছেড়ে যেতে বলা হলেও তারা ছাড়তে অস্বীকার করে। শুরু হয় লঙ্কাগুড়ো ছোটানো, যশুয়া ওয়াং সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন ২৮ সেপ্টেম্বর গণঅসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন অকুপাই সেন্ট্রালের নেতা বেনি টাই-এর মতো আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্ব। হংকং-এর সরকারি সদর দপ্তরের সামনে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর উপস্থিতিতে বেনি টাই অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। হংকং-এর বর্তমান প্রধান নির্বাহী সি ওয়াই লিয়াং 'রাজনৈতিক সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছেন' বলেও একটি বিবৃতিতে দাবি করেছে অকুপাই সেন্ট্রাল মুভমেন্ট। তাঁর পদত্যাগও চাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হংকং কর্তৃপক্ষের তরফে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাবনা পাঠানোরও দাবি জানান তারা। ওই প্রস্তাবে হংকং-এর জনগণের গণতন্ত্রের দাবির পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে হবে বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয়। প্রধান নির্বাহী সি ওয়াই লিয়াং তাদের দাবির প্রতি সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন তীব্র হতে থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। হংকং বা বেইজিং-এর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও সংবেদনশীলতা দেখায় নি। ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলনকারীদের অনড় মনোভাব সত্ত্বেও বেইজিং বলেছে, হংকং কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী বিক্ষোভ দমন করতে পারবে বলে মনে করে তারা।

৪ অক্টোবর থেকে আন্দোলনের বিরোধী শক্তি রাস্তায় নামে। কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সপক্ষে তারা 'নীল রিবন' পড়ে মিছিল করে। রাস্তা আটকে হংকং-বাসীর দৈনন্দিন জীবনকে বিঘ্ন করার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়। ৭ অক্টোবর থেকে ক্রমশ জমায়েতের শক্তি কমতে শুরু করে এবং আন্দোলনের নেতারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে সম্মত হন। ১০ অক্টোবর বৈঠকের দিন ঠিক হয়। কিন্তু ৯ অক্টোবর হংকং কর্তৃপক্ষ বৈঠক বাতিল করে দেয়। ১০ অক্টোবর থেকে প্রতিবাদকারীরা আবার বিপুল সংখ্যায় আন্দোলনে ফিরে আসে, জমায়েত হয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জি জিনপিং-কে দাবি সম্বলিত চিঠি পাঠানো হয়। ১৩ অক্টোবর থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আন্দোলন বিরোধীর জনতার বেশ কিছু জায়গায় সংঘর্ষ হয়। আন্দোলন বিরোধীরা 'অ্যাপল ডেইলি' ও 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর বিতরণে বাধার সৃষ্টি করে, আন্দোলনের পক্ষে সংবাদপত্রের পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশনার অভিযোগ আনা হয়।

চলমান আন্দোলন ও তার বিরোধিতা আগামীদিনে কোন চেহারা নেবে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। আশা থাকবে হংকং বা বেইজিং-এর কর্তৃপক্ষ আন্দোলন ও তার ন্যায্য দাবিগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হবেন। ছাত্র ও গণআন্দোলনকে বন্দুক, কাঁদানে গ্যাস বা ট্যাঙ্ক দিয়ে দমন করাটা যে চরম স্বৈরাচারী ও কলঙ্কজনক কাজ সেটা বেইজিং বা হংকং-এর কর্তৃপক্ষ যত দ্রুত অনুধাবন করেন ততই মঙ্গল। তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ১৯৮৯-এর কলঙ্কিত ঘটনার কোনও ধরণের পুনরাবৃত্তি কেউই চান না। নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিস্থাপিত করে মুক্ত গণতন্ত্রের দাবিতে হংকং-এর জনগণের আন্দোলনকে সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ অবশ্যই সমর্থন করবেন।

- সৌভিক ঘোষাল

'বীর' সাভারকর, ...

সাতের পাতার পর

একটা প্রশ্ন ওঠে। হিন্দুত্বের মতাদর্শের তাত্ত্বিক নেতা ও সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম গুরু সাভারকারের নামে আন্দামান বিমান বন্দরের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি হঠাৎ নাম-না-করে কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ করলেন কেন?

সাভারকার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং দশ বছর সেলুলার জেলে কাটিয়েছিলেন। এই তথ্যটিকে যথাযথ স্বীকৃতির মাধ্যমে যদি সাভারকারকে গৌরবের আসনে বসানো হয়, তবে তা কি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের নিছক দর্শকের ভুমিকার সঙ্গে খাপ খাবে? (ক্রমশ)

- অশোক চট্টোপাধ্যায়

ধান সংগ্রহে পিছিয়ে কেন?

চারের পাতার পর

যুক্ত করে ধান সংগ্রহের প্রচার এবং কেনায় অভিযানে নামলো না কেন?

দ্বিতীয়ত, এফ সি আই-কে কেন এই অজুহাত দেখাতে সুযোগ দেওয়া হল যে সংগঠিত পর্যাপ্ত হাটবাজার না থাকায় ও সরকারপক্ষ মাণ্ডি বা শিবির না খোলায় সংগ্রহ কাজ মার খেয়েছে। তাছাড়া সংগ্রহ এফ সি আই-কে দিয়েই শুধুমাত্র নয়, সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমেও তো করতে হত। অথচ সেসব করা হল না। মুখ্যমন্ত্রী খুব শুনিয়েছিলেন বিশাল বিশাল অত্যাধুনিক মজুতঘর হবে। টেণ্ডারে শর্ত-মান ঘোষণা করেছিলেন ন্যূনতম ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ক্ষমতা থাকতে হবে। এককথায় মাণ্ডির কর্পোরেটকরণই চেয়েছিলেন। সবই চলেছে ফাঁকা প্রচার।

অন্য একটা খবর হল, খাদ্যশস্যের মজুতঘর নির্মাণের জন্য নাবার্ড (ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট) এতদিন যেখানে কেবল সরকারি সংস্থাকে ঋণ দিত, এবার থেকে বেসরকারি সংস্থাকে ঋণ দেবে। গতবছর এই খাতে এরাজ্যকে দিয়েছিল ৬৬২ কোটি টাকা। এবছর বরাদ্দ ১৪২ কোটি টাকা কমিয়ে করেছে ৫২০ কোটি টাকা। টাকা বেশি-কম কি এসেছে, আসছে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করছে না। কিন্তু মজুতকরণের পরিকাঠামো তৈরী হওয়ার নতুন কোন নজীর স্থাপন হচ্ছে না। এফ সি আই থেকে রাজ্য সরকার উভয়পক্ষেরই মতিগতি মর্জিমাফিক। রাজ্যের খাদ্যদপ্তর বলছে বটে, অক্টোবর মাস পর্যন্ত চাষিদের থেকে চাল কেনার উদ্যোগ চলবে এবং আর ২ লক্ষ মেট্রিক টন সংগ্রহ হবে। দেখা যাক, নভেম্বর মাসে খাদ্যমন্ত্রী কি ম্যাজিক দেখান।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com